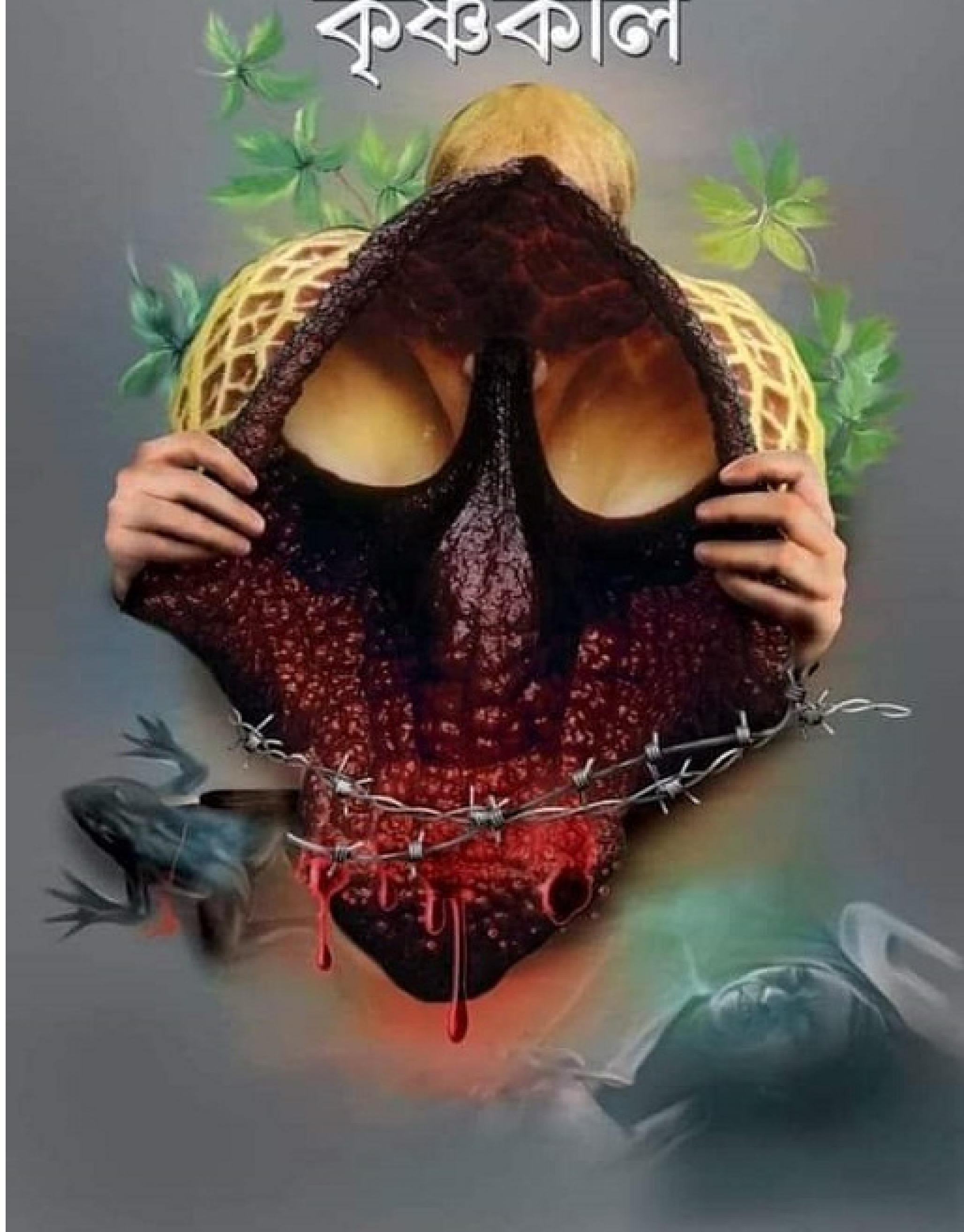
সৈকত মুখোপাধ্যায়

মাংস-লতার কৃষ্ণকলি




সৈকত মুখোপাধ্যায়
মাংস-লতার
কৃষ্ণকলি

মাংস-লতার কৃষ্ণকলি

মাংস-লতার কৃষ্ণকলি

সৈকত মুখোপাধ্যায়

দীপ প্রকাশন

২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

দীপ
MANSHA-LATAR KRISHNAKALI
by Saikat Mukherjee

ISBN 978-93-91168-72-8

Phone 033-2241-2538 ♦ 98310 52249
website www.deepprakashan.com
email deepprakashan@gmail.com

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২২
প্রচ্ছদ সৌম্যদীপ প্রধান
প্রকাশক শংকর মণ্ডল
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক কল্পনা অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০১৫

উৎসর্গ

অশেষ গুণে গুণবান, আমার বন্ধুদম্পতি,
সাগরিকা রায় আর গৌতমেন্দু রায়ের করকমলে।

হতে পারে না?

একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষের পিঠ থেকে শেকড় নেমে মেঝের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। তাই সে মরছিল না।

হতে পারে না।

আকাশ থেকে নেমে এসেছিল এক মহাজাগতিক নারীর বিশাল উরুসন্ধি, জন্মদ্বার ও জরায়ু। সেই পাথুরে টিলা এখনো সন্তানের জন্ম দেয়।

হতে পারে না।

বায়োলজির ডিসেকসন ক্লাসে একটা ব্যাঙের পেটের মধ্যে পাওয়া গেল এক ছাত্রীর কানের দুল। ব্যাংটাকে দেখতে ছিল ঠিক ল্যাবরেটরি-অ্যাসিট্যান্টের ছেলেটার মতন।

হতে পারে না।

সত্যি? হতে পারে না?

বাস্তববাদী গল্প-উপন্যাসে হয় তো পারে না, কিন্তু ফ্যানটাসিতে পারে। সেটাই ফ্যানটাসির মজা তার ম্যাজিক।

ফ্যানটাসি যেমন একজন লেখকের কল্পনাশক্তির চূড়ান্ত পরীক্ষা নেয়, তেমনই পাঠককে দেয় দৈনন্দিনতার একঘেয়েমি থেকে মুক্তি।

তাই বলে কি এইধরণের গল্প-উপন্যাসের সবটাই কল্পনা? সবটাই আকাশকুসুম? উঁহু। এই সংকলনের গল্পগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন, তাদের শেকড় রয়েছে আমাদের ঘরের পেছনের বাগানের মধ্যে, অর্থাৎ তাদের পটভূমিকা বাস্তব। কিন্তু শেষ অবধি রূপকথার জ্যাকের শিমগাছের মতন এ-সব কাহিনীর ডালপালা চলে গেছে মেঘের ওপারে এক অলীক রাজ্যে।

এই ধারা কিন্তু একেবারেই নতুন নয়। আধুনিক চিত্রশিল্পে তো সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই রিয়ালিজমের পাশাপাশি সুররিয়ালিজম চলে এসেছে। বিশ্বসাহিত্যেও ফ্যানটাসি-নির্ভর গদ্য-পদ্য সেই কবে থেকেই তুমুল জনপ্রিয়। তাহলে বাঙলা-গল্পই বা কী অপরাধ করল যে, তাকে শুধুই বাস্তবের নকল করে যেতে হবে?

অন্তত পাঠকদের কাছে যে অপরাধ কিছু করেনি, তা প্রমাণিত হয়ে গেছে আমার আগের দুটি ডার্ক-ফ্যানটাসির গল্প-সংকলনে। এই-সময়ের পাঠক-পাঠিকারা সাদরে গ্রহণ করেছেন সেই বইদুটিকে; আর, একজন মূলধারার লেখকের কাছে পাঠকই তো ঈশ্বর।

লেখকের একমাত্র দায়িত্ব তাঁর লেখা গল্পকে সুখপাঠ্য করে তোলা, আকর্ষনীয় করে তোলা। পাঠক যেন তাঁর গল্প পড়ে শূন্যহাতে না ফেরেন। এই বইয়ের আখ্যানগুলির মধ্যে আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যে আমি ঠিক সেই চেষ্টাটুকুই করেছি। চেষ্টা করেছি আপনাদের মনোরঞ্জন করতে।

সফল হয়েছি কিনা সে তো আপনারাই বলবেন। আমি এরপর শুধু অধীর আগ্রহে আপনাদের প্রতিক্রিয়ার জন্যে অপেক্ষাই করতে পারি।

সল্টলেক।
২৩শে মাঘ, শ্রীপঞ্চমী,
১৪২৮ বঙ্গাব্দ।

বিনত,

সৈকত মুখোপাধ্যায়।

গল্পক্রম

উল্কাপাতের মাঠ

বাইশে এপ্রিল বিকেলে অরিত্র আত্মহত্যা করবার জন্যে যোশিমঠ-আউলি রোডের ধারে এক জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছিল। তার আগে আত্মহত্যার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল সে।

ঘুমের ওষুধের পাতাগুলো তাকে নতুন করে জোগাড় করতে হয়নি। ওগুলো গত একবছর ধরেই অরিত্রর সঙ্গে অজ্ঞাতবাসের পথে-পথে ঘুরছিল; কলকাতার বারোটা আলাদা-আলাদা ওষুধের দোকান থেকে কেনা বারোটা সিডেটিভ ট্যাবলেটের পাতা।

আসলে প্রথমে অরিত্রর প্ল্যান ছিল, জয়িতাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েই মারবে। তারপরে নেট-ফেট ঘেঁটে দেখেছিল, ওকে মারার জন্যে যতগুলো ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে, ততগুলো ট্যাবলেট ওকে না জানিয়ে খাওয়ানো অসম্ভব। তখন ও প্ল্যান চেঞ্জ করে। মাত্র দুটো ট্যাবলেট কফির মধ্যে মিশিয়ে জয়িতাকে খাইয়েছিল, যাতে গলায় ছুরি বসানোর সময় রেজিস্ট করতে না পারে। বাকি ওষুধগুলো কলকাতা থেকে পালাবার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

তখন প্রমাণ লোপ করার চিন্তা থেকেই ওষুধের স্ট্রিপগুলোকে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়েছিল অরিত্র। কিন্তু ক্রমশ যখন ওর হাতের টাকা ফুরিয়ে এল, বুঝতে পারল যে চিরকাল লুকিয়ে থাকার পক্ষে মানুষের আয়ু ভীষণই লম্বা এবং সর্বোপরি যখন ও খবর পেল যে পুলিশ ওকে ঘিরে এবার জাল গুটিয়ে আনছে, তখন ওর মাথায় এল, তাহলে ঘুমের ওষুধগুলোকে ফেলে না দিয়ে একসঙ্গে সবকটা খেয়ে নেওয়া যেতে পারে তো।



তবে এছাড়াও আত্মহত্যা করার আগে আরও অনেক কাজ থাকে মানুষের। বাইশে এপ্রিল সকাল থেকে অরিত্র সেই কাজগুলো সেরে ফেলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

যোশিমঠের সবচেয়ে গরিব বস্তিটার মধ্যে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সে গত দু-মাস বাস করছিল। যার ঘর তাকে পুরোমাসের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলল, এখানকার কাজ মিটে গেছে; তাই সে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে।

যে জামাকাপড়গুলো পরে বিকেলে বেরোবে বলে ঠিক করেছিল, সেগুলো বাদে বাকি সমস্ত জামাকাপড়, দু-চারটে বাসনপত্র যা ওর ছিল আর বালিশ-কম্বল — খুব ভোর-ভোর বেরিয়ে সব রেখে দিয়ে এল একটা মন্দিরের গেটে। পরে, বেলার দিকে একবার সেখানে গিয়ে দেখে এসেছিল, ভিখিরিদের হাতে-হাতে জিনিসগুলো চমৎকারভাবে লোপাট হয়ে গেছে।

বাকি ছিল ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী কালো কাঁধব্যাগটা, যেটা থেকে পুলিশ ওর মৃতদেহ শনাক্ত করতে পারে। তাই দুপুরে হোটেলে খেয়ে এসে, ব্যাগটা খুলে, ভেতরের কাগজগুলো নিয়ে বসল অরিত্র।

প্রথমেই বেরিয়ে এল সেই প্রেসক্রিপশনটা, যেটা দেখিয়ে ও ঘুমের ওষুধ কিনেছিল। ওদের কোন্নগর নবপল্লির বুড়ো ডাক্তার শম্ভু দেবনাথের প্রেসক্রিপশন। এল.এম.এফ ডাক্তার। তার ওপরে আশি পার করার পর ডাক্তারবাবুর নিজেরই একটু ভীমরতি মতন হয়ে গিয়েছিল। সেই সুযোগটাই নিয়েছিল অরিত্র। মিথ্যে করে নিজের ইনসমনিয়ার কথা বলে, ঘুমের ওষুধটা প্রেসক্রাইব করিয়ে নিয়েছিল।

তা ছাড়া কলকাতা থেকে পালিয়ে আসার সময় ওই ছোটো কাঁধব্যাগটা ভরতি করে ক্যাশ-টাকা নিয়ে এসেছিল সে। যেভাবে ঘুমের ওষুধ জমিয়েছিল, ঠিক সেইভাবেই জয়িতাকে খুন করার আগে অল্প অল্প করে প্রতিদিন এ.টি.এম থেকে টাকা তুলে ব্যাগে রাখত। কলকাতা থেকে পালাবার সময় সেই এ.টি.এম কার্ড আর সেলফোন হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে গঙ্গায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে এসেছিল। সেইজন্যেই পুলিশ এখনও তাকে ট্রেস করতে পারেনি।

তবে টাকা ফুরিয়ে এসেছে। আর মাত্র কয়েকটা পাঁচশো-টাকার নোট ব্যাগের এক কোনায় পড়ে ছিল। এগুলোর কি আর কোনো প্রয়োজন রয়েছে? একমিনিট ভুরু কুঁচকে ভাবল অরিত্র। তারপর আপনমনেই বলল, 'নাঃ'। বেঁচে থাকতে গেলে কাজে লাগত এমন আরও কিছু কাগজপত্র ছিল ব্যাগটার মধ্যে। অরিত্র ভাবল, বাঁচাই যখন হচ্ছে না তখন সেই কাগজগুলোর সঙ্গে নোটগুলোর কীই বা তফাত। সবই একসঙ্গে ফেলে দেবে বলে ঠিক করল সে।

আর ছিল একটা প্লাস্টিকের খেলনা। চাবি ঘুরিয়ে দম দেওয়া একটা দোলনা। অনেকটা হ্যামকের মতন দেখতে। হ্যামকে একটা খোকা শুয়ে ঘুমোচ্ছে। দম দিয়ে ছেড়ে দিলে দোলনাটা সামনে-পেছনে দুলতে থাকে আর টুংটাং করে মিষ্টি একটা বাজনা বাজে। এটা অরিত্ররই ছোটোবেলার খেলনা। ওর প্রাণ।

টাকা আর কাগজপত্রগুলো জ্যাকেটের দু-পকেটে ঠেসে ঢুকিয়ে নিল সে। খেলনাটাকে চালান করে দিল জ্যাকেটের নীচে, পেটের কাছে। তারপর খালি ব্যাগটাকে নালার ধারে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ঘরের দরজায় তালা লাগাল না। শুধু যাবার সময় বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে গেল।

অরিত্র চেয়েছিল তার মৃতদেহটা লোকচক্ষুর আড়ালে একটা বিশাল পাইনগাছের গুঁড়ির আড়ালে পড়ে থাকুক। তখন বসন্তকাল। সে স্বপ্ন দেখত, সামনের বর্ষায় তার শরীরের অবশেষ থেকে অনেক শিশু-বৃক্ষ জন্ম নিচ্ছে। পাঁজরের ফাঁক দিয়ে লতিয়ে উঠছে আইভি লতা। করোটি ফাটিয়ে মাথা চাড়া দিচ্ছে হেমলক আর বেলেডোনা-গাছ আর তার গলিত মাংসের রস শুষে নিয়ে পাহাড়ি ধুতরোর চারাগুলো লকলক করে বেড়ে উঠছে।

হ্যাঁ, শুধু বিষাক্ত গাছপালার কথাই মাথায় আসত অরিত্রর। কারণ, তার কেমন যেন ধারণা হয়েছিল যে, যে-মানুষ বিষ খেয়ে মরে, অবিষাক্ত উদ্ভিদেরা তার শরীরের সার সহ্য করতে পারবে না।

তাতে অখুশি ছিল না অরিত্র। সে ভাবত, বিষাক্ত গাছেরাও তো গাছ। যতক্ষণ না তুমি তার পাতায়, ফুলে কিংবা ফলে হাত দিচ্ছ, ততক্ষণ সেও টগর, জুঁই কিংবা হাস্নুহেনার মতোই সুন্দর। যেমন বিষাক্ত মানুষেরাও সুন্দর মানুষ, যতক্ষণ না অন্য কেউ বলে দিচ্ছে যে, ওই দ্যাখো, ওই মানুষটা কিন্তু ভয়ানক বিষাক্ত।

আসলে এইসব কথা ভাবার সময় অরিত্রর মাথার মধ্যে ওর মা আর জয়িতার ছবিগুলোই ঘুরত। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই জয়িতা অরিত্রর মাকে কথায়-কথায় বলত, 'আপনি একজন বিষাক্ত মহিলা'। শেষদিকে আর 'আপনি-টাপনি' নয়; সরাসরি তুই-তোকারি করেই শাশুড়িকে বলত, 'তুই একটা ডাইনি। না হলে বিধবা হয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে পর্নো-সাইট দেখিস! আমি সব জানি।'

অরিত্রর কিন্তু নিজের মাকে কখনও বিষাক্ত মনে হয়নি।

অরিত্রর বিয়ের ঠিক তিনবছর বাদে, সেটা ছিল বছর শেষের রাত, একটা পার্টি থেকে বাবা আর মা বাড়ি ফিরছিল। বাবাই ড্রাইভ করছিলেন, মা ছিল পাশে। সেদিন মাঝরাতের পর ঘন কুয়াশা নেমেছিল কলকাতার বুকে। সায়েন্স সিটির কাছে বাবার হালকা হ্যাচ-ব্যাক সপাটে ধাক্কা মেরেছিল ফ্লাইওভারের একটা পিলারের পেটে। বাবা সঙ্গে সঙ্গেই মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, বাবার পাশের সিটে বসে থাকা মায়ের

এক্সটার্নাল ইনজুরি বলতে ছিল শুধু ভুরুর ওপরে একটা ছোট্ট ক্ষত। আসল ক্ষতিটা হয়েছিল ভেতরে — পায়ের নার্ভগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল।

তবে অদম্য প্রাণশক্তি ছিল বটে মায়ের। অরিত্র চোখ বুজলেই এখনও দেখতে পায়, ভীষণ ফরসা আর ভলাপচুয়াস চেহারাটা নিয়ে ওর মা তারপরেও কথায়-কথায় হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠছে। দু-হাত দিয়ে হুইল-চেয়ারের চাকা ঘুরিয়ে ড্রেসিং-টেবিলের সামনে গিয়ে বসছে। ওখানে বসেই একমনে চুলে কলপের ব্রাশ বোলাচ্ছে। কিংবা চেয়ারের পেছনদিকে মাথা হেলিয়ে চিকেনের লেগপিস থেকে ছিঁড়ে নিচ্ছে মাংসের ফাইবার, ঝোল গড়িয়ে পড়ছে কনুই বেয়ে।

জয়িতা তো ভুল বলতে পারে না। এত পজিটিভ-এনার্জি সত্ত্বেও মা নিশ্চয়ই ডাইনিই ছিল। সেই মা-ও কিন্তু অপঘাতেই মারা গেল। হুইল-চেয়ারটা যে কেমন করে দোতলার সিঁড়ির মাথা থেকে নীচে গড়িয়ে পড়েছিল সেটা এক রহস্য। অরিত্র তখন অফিসে ছিল। বাড়িতে ছিল কেবল জয়িতা।

জয়িতার বুদ্ধিকে আজও শ্রদ্ধা করে অরিত্র। এমনকি এও মনে হয় যে, জয়িতার গলার নলি কেটে দেবার আগে তার কফির মধ্যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়ার মতন বুদ্ধি তার নিজের মাথায় কখনোই আসত না, যদি না সে জয়িতার সঙ্গে চার বছর একই ছাদের নীচে বাস করত। জয়িতার খর চোখের নজর থেকে ক্রমাগত নিজের আর মায়ের নানান ক্রিয়াকলাপ লুকোতে-লুকোতেই তার মধ্যে একটা চতুরালি জন্ম নিয়েছিল।

অরিত্র জানে, জয়িতা নিজেও ছিল বিষাক্ত। কিন্তু ওরও সৌন্দর্য নিয়ে কোনো কথা হবে না।

বিষাক্ত অথচ সুন্দর ওই দুই নারীর সঙ্গে অরিত্রর জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল বলেই হয়তো সে মৃত্যুর পরে আবার বিষফুল, বিষলতা হয়ে জন্মাতে চাইত।

সে যাই হোক, যেটা আমাদের চমকিত করে সেটা হল, পেছনের সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়ে, কাঁধব্যাগে বারো-পাতা অ্যালজোলাম নিয়ে বেরিয়ে আসার পরেও, সেই বাইশে এপ্রিল বিকেলে অরিত্রর সুইসাইড করা হয়নি। যদিও আর কিছুদিনের মধ্যেই সে মারা গিয়েছিল। তবে তার কারণ অন্য।

যোশিমঠ থেকে যে-রাস্তাটা আউলির দিকে চলে গেছে, সেই চকচকে পিচরাস্তার ধারে একটা মনোমতন জায়গা বেছে রেখে গিয়েছিল অরিত্র — যেভাবে নাকি মধ্যযুগে নবাব-বাদশাহরা নিজেদের কবরের জায়গা পছন্দ করে রাখতেন।

সময়টা, শুরুতেই বলেছি, এপ্রিল মাসের শেষদিক। ফলে আউলির দিকে স্কি করতে যাবার ভিড় তখন আর ততটা ছিল না, কারণ, সে-বছর বেশ তাড়াতাড়ি আউলির স্কি-গ্রাউন্ডের বরফ গলে গিয়েছি। যোশিমঠ-আউলি রোড তখন সারাদিন শুনশান পড়ে থাকত।

দু-পাশের ঘন পাইনবনে তখন অবিশ্রান্ত ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ ওঠে না। সেই নৈঃশব্দ্যকে ছিঁড়ে মাঝেমধ্যে তীব্র স্বরে ডেকে ওঠে একটা পাখি। অনেকটা সময়ের ব্যবধানে একটা করে গাড়ি রাস্তার এক বাঁক থেকে বেরিয়ে অন্য বাঁকের আড়ালে হারিয়ে যায়। বাকি সময়টায় রাস্তার ওপরেই তিতির কিংবা বনমোরগ চরে বেড়ায়।

সেখানেই একটা বিশাল পাইনগাছের গোড়ায় পাথরের ওপরে বসে ছিল অরিত্র। জলের বোতল আর ওষুধের স্ট্রিপগুলোকে একপাশে সরিয়ে রেখে, ব্যাগ থেকে কাগজপত্রগুলো বার করে একটা ছোট গর্তের মধ্যে ছুড়ে ফেলছিল। ও হ্যাঁ, সেই খেলনা দোলনাটাকেও সে জলের বোতলের পাশে রেখে দিয়েছিল। ছোটোবেলা থেকেই ওই দোলনাটাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে না শুলে সে ঘুমোতে পারে না। আজকেও অরিত্র ঠিক করেছিল তাই করবে। টুংটাং আওয়াজ শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়বে শেষবারের মতন।

তবে তার আগে কাগজগুলোকে মাটিতে পুঁতে ফেলা দরকার। সেইজন্যেই অরিত্র গর্তটার মধ্যে কাগজ আর পাঁচশো টাকার নোটগুলোকে ফেলে দিচ্ছিল। ফেলতে গিয়ে দেখলো, ওগুলোর মধ্যে একবছর আগের

একটা বাংলা নিউজপেপারের পাতাও রয়েছে। বিয়ের কনের সাজে জয়িতার মুখের একটা ছবির সঙ্গে ওর খুনের খবরটা ওখানেই বেরিয়েছিল। খবরের শেষে লেখা আছে, মৃতার স্বামী ফেরার।

কাগজগুলো গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়ার পরে, পা দিয়ে ঝুরো মাটি টেনে-টেনে গর্তটাকে বোজাতে শুরু করেছিল অরিত্র। এর পরেই সে ঘুমের ওষুধগুলো খেয়ে নিত। কিন্তু ঠিক তখনই তার পেছনে দাঁড়িয়ে কেউ হিন্দিতে প্রশ্ন করল, 'লুকোতে চাও? আমার একটা ভালো জায়গা জানা আছে।'

অরিত্র চমকাল না। মানুষ ভয় পেলে চমকায়। কিন্তু যে-মানুষ আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তার আর ভয় থাকে না। অরিত্র পেছনের দিকে না তাকিয়েই বুটের হিল দিয়ে ঝুরোমাটির ওপরে দুরমুশ করতে-করতে উত্তর দিল, 'না। আর লুকোতে চাই না। একবছর লুকিয়ে থেকে-থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পরেশান হো গ্যয়া হুঁ ম্যায়। এবার মরতেই চাই।'

লোকটা ঘুরে ওর সামনে চলে এল। শান্ত গলায় বলল, 'ওই একই হল। আত্মহত্যা আর আত্মগোপনের মধ্যে খুব একটা তফাত নেই।'

এবার অরিত্র মুখ তুলে লোকটাকে দেখল।

উন্মাদ নয়, সন্ন্যাসীও নয়। মাঝবয়সি লোকটাকে দেখে প্রথমেই মনে আসে কোনো অভিযাত্রীর কথা — এক্সপ্লোরার।

রোদে-পোড়া চামড়া। গাঁটওলা বাঁশের মতন শক্তপোক্ত চেহারা। ঘাড় অবধি কাঁচাপাকা চুল দেখলেই বোঝা যায় চিরুনি চলে না। সেরকমই নুন-মরিচ দাড়ি-গোঁফ। সন্দেহ নেই, এ লোক জীবনের বেশিরভাগ সময়টা খোলা আকাশের নীচে কাটিয়েছে। লোকটার পরনে ছিল ঘিয়ে রঙের একটা ট্রাউজার, মেটিরিয়ালটা যে কী সেটা বুঝতে পারল না অরিত্র আর ওই একই কালারের চামড়ার জ্যাকেট। পিঠে একটা ক্যানভাসের স্লিং-ব্যাগ ঝুলছিল।

লোকটা নিঃসন্দেহে শিক্ষিত। একপলক তাকিয়েই ওষুধগুলোর চরিত্র বুঝে নিয়েছে। অরিত্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পায়ের বুট থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলতে শুরু করল। কী আর করবে? অন্য কারওর চোখের সামনে আত্মহত্যা করতে তার একেবারেই ইচ্ছে করছিল না। আর সে চাইলেও লোকটা বোধহয় সেটা করতে দিত না।

আগন্তুক এবার অরিত্রর মুখোমুখি অন্য একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপরে আরাম করে বসল। তারপর খুব ক্যাজুয়ালি — যেন ক্লাসে লেকচার দিচ্ছে এইভাবে বলল, 'দোলনা এক আশ্চর্য জিনিস, বুঝলেন। আমরা সবাই দোল খেতে ভালোবাসি। দুলুনি জিনিসটা আমাদের একটা নিশ্চিন্ততা এনে দেয়, আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। ট্রেনের বাঙ্কের দুলুনি, নৌকার পাটাতনের দুলুনি, হ্যামকের দুলুনি কিংবা বাচ্চাদের দোলনা — সে যাই হোক। কেন এরকম হয় জানেন?।'

অরিত্র অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?।'

প্রশ্নটা করেই অরিত্র বুঝতে পারল, তার মৃত্যুচিন্তায় অনেকদিন বাদে এই প্রথম একটা ছেদ পড়ল; অন্য কিছুতে আগ্রহ দেখিয়ে বসল সে। অবশ্য অরিত্র আর কিছু ভাববার সুযোগ পেল না। কারণ লোকটা ততক্ষণে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করে দিয়েছে—

'বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, এর সঙ্গে আমাদের মাতৃগর্ভের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। মাতৃগর্ভ মানে জরায়ু — বাইরের কোনো আঘাত যেখানে পৌঁছোয় না।

'একবার ভাবুন জরায়ুর ভেতরে ভ্রূণের কথা। না না, আমি জানি, আপনি প্রায়ই ভাবেন। সত্যি কথা বলতে কী, আপনার পুরো জীবনটাই ওই ভাবনা দিয়ে গড়া। তবু আর একবার মনে করুন অ্যামনিওটিক-ফ্লুইডের সেই স্নিগ্ধ ছোঁয়া — না গরম, না ঠান্ডা এক জলের বিছানা। সেই প্রায়-নৈঃশব্দ্য। সেই অন্ধকার।

'দীর্ঘ ন'মাসের সেই নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে বাইরে এসে আমরা বড্ড ভয় পেয়ে যাই। পাবই তো। এত আওয়াজ বাইরের পৃথিবীতে। এত আলো। এত গরম কিংবা শীত। সেইজন্যেই আমরা আবার মাতৃগর্ভের

নিশ্চিন্ততা খুঁজি। আর ঠিক তখনই ওই দুলুনি আমাদের সেই প্রার্থিত নিশ্চিন্ততা এনে দেয়। কেন বলুন তো?'

'কেন?' আবার প্রশ্ন করে বসে অরিত্র।

'কারণ গর্ভবাসের দিনগুলোতে আমরা একটা মাত্র শব্দের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। দিন নেই, রাত নেই, মাসের পর মাস একটাই শব্দ — লাব ডুব, লাব ডুব, লাব ডুব। মায়ের হৃৎপিণ্ডের সিস্টোল ডায়াস্টোলের শব্দ। হ্যাঁ, জরায়ুর মধ্যে ওই একটিমাত্র শব্দই আমাদের কানে পৌঁছোয়। ঘুমপাড়ানি গান আর দোলনার দোল আসলে ওই হৃদয়ের ছন্দের নকল।'

'এসব কথা হঠাৎ আমাকে শোনাতে বসলেন কেন? কেটে পড়লেই পারেন তো এবার।' — কঠিনমুখে বলল অরিত্র।

'ওই খেলনাটার জন্যে' — আঙুল দিয়ে প্লাস্টিকের দোলনাটার দিকে দেখাল লোকটা। বলল, 'খেলনা দিয়ে আর কতদিন নিজেকে ভোলাবেন? সত্যিকারে মাতৃগর্ভে ফিরতে চান না?।'

অরিত্রর চোখদুটো চকচক করে উঠল। সে একটুও দেরি না করে উত্তর দিল, 'চাই। মা বেঁচে থাকতেও চাইতাম। মা মরে যাওয়ার পরেও চেয়েছি। কিন্তু জয়িতার জন্যে পারিনি।'

'জয়িতা কে? আপনার স্ত্রী? বেঁচে নেই বোধহয়, তাই না?'

অরিত্র সেই প্রশ্নের উত্তরে মাথা নাড়ে।

'জয়িতা কেমন করে মারা গেছে সেটা আন্দাজ করতে পারছি। আপনার মা নিশ্চয়ই তার কিছুদিন আগেই মারা গিয়েছিলেন। আপনি কি আপনার মায়ের মৃতদেহ সারাজীবন ঘরের মধ্যে রেখে দিতে চেয়েছিলেন? জয়িতা রাখতে দেয়নি?।'

অরিত্র অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এত সব জানল কেমন করে লোকটা!

লোকটা ওকে অবাক হতে দেখে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল, তবে ও-ব্যাপারে আর কিছু বলল না। বরং আবার সেই আগের প্রসঙ্গেই ফিরে গিয়ে বলল, 'শুনুন। আমরা সকলেই, সারা জীবন, মাতৃগর্ভের নিশ্চিন্ততায় ফিরে যেতে চাই। সংগমের মধ্যেও আমাদের সেই ইচ্ছেই লুকিয়ে থাকে। কিন্তু ওভাবে ফেরা যায় না। যখন ফিরতে পারে না, তখনই আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ আত্মহত্যার কথা ভাবে।'

অরিত্র ঠিক বুঝতে পারছিল না, এবার তার অপমানিত বোধ করা উচিত কিনা। এটা তো পরিষ্কার যে, লোকটা তাকে উদ্দেশ করেই ওই সুইসাইড-ফুইসাইডের কথাগুলো বলছে। কিন্তু সে ঠিক করল আপাতত যেটা বেশি জরুরি, সেটা নিয়েই কথা বলা যাক। সে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'ওভাবে হয় না বলছেন। অন্য কোনো রাস্তার কথা জানা আছে নাকি — মাতৃগর্ভে ফেরার?।'

'আছে বইকি।' লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। বলল, 'আমি আপনাকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিতে পারি, আই মিন, সেই মহাজাগতিক মাতৃগর্ভে'।

অরিত্র হাঁ করে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা বলল, 'বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠিক আছে, চলুন আমার সঙ্গে। ভয়ের সেরা ভয় হচ্ছে মৃত্যুভয়; আপনার তো সেটাই নেই। তাহলে চিন্তা করছেন কেন?।'

অরিত্রও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চিন্তা নয়, আসলে ভাবছিলাম সেটা কীভাবে সম্ভব। যাই হোক, আপনি বলছেন যখন, চলুন।'

রওনা দেওয়ার আগে অরিত্র একটু ইতস্তত করে পাঁচশোর নোটগুলো কুড়িয়ে পকেটে ভরতে যাচ্ছিল। হয়তো ভাবছিল, মরাই যখন হল না তখন আর ওগুলোকে...। লোকটা বলল, 'উঁহু উঁহু। কিচ্ছু নেবেন না। সব কিছু মাটির নীচে চাপা দিয়ে দিন। জলের বোতল, ঘুমের ওষুধ আর হ্যাঁ, দোলনাটাও। ওগুলো আর আপনার কোনো কাজে লাগবে না। আপনি যখন মায়ের পেটে ছিলেন তখন ওসব জিনিস ছিল আপনার কাছে?।'

অরিত্র লজ্জিতমুখে ঘাড় নাড়ল।

লোকটা বলল, 'আমারও টাকার প্রয়োজন নেই। আমি একজন 'হান্টার-গ্যাদারার'। শিকার করি, বনের ফলমূল কুড়িয়ে খাই। এই যে পোশাক দেখছেন, এগুলো নিজেই জন্তুর চামড়া সেলাই করে বানিয়ে নিয়েছি। যাই হোক, চলুন এবার! অনেকটা পথ যেতে হবে।'

অরিত্র লোকটার সঙ্গে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে পড়ল। তখন সন্ধে হচ্ছিল। চারিদিকে ময়ূর ডাকছিল খুব।

লোকটাকে অনুসরণ করে সেদিন প্রায় সারারাত হেঁটেছিল অরিত্র। ঘণ্টাখানেক হাঁটার পরেই জঙ্গলের আওতা থেকে বেরিয়ে এসেছিল ওরা।

বৈশাখ মাসের ত্রয়োদশীর রাত ছিল সেটা। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছিল চরাচর। প্রান্তরের প্রতিটি পাথরের, প্রতিটি ঘাসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের একটা করে কালো রঙের রেপ্লিকা — যাকে বলে ছায়া। অরিত্রর মনে হচ্ছিল যেন ওদের চেনা বস্তুজগতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অচেনা এক অন্ধকার জগৎ। অলটারনেটিভ-ইউনিভার্স।

রাতের তৃতীয় প্রহরে চাঁদ অস্ত যাবার পরে ছায়াগুলো মিলিয়ে গেল। কিন্তু তখন শুরু হল এক অন্যরকমের কালাজাদু। কোটি-কোটি তারা চতুর্দিক থেকে প্রান্তরটাকে ঘিরে ধরল। শুধু মাথার ওপরে নয়, পায়ের নীচেও তারা দেখা যাচ্ছিল। এতটাই ভয়ানক সেই অভিজ্ঞতা যে, একটা সময়ের পর অরিত্র আর না পেরে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার ভয় হচ্ছিল, এর পর তারার আগুনে তার পা পুড়ে যাবে।

আগন্তুক লোকটা শিরদাঁড়া সোজা রেখে ওর সামনে-সামনে হেঁটে চলেছিল। কথাবার্তা বলছিল না বিশেষ। কিন্তু অরিত্র থেমে যেতেই সে কীভাবে যেন বুঝতে পারল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী হল?।'

অরিত্র ভয়ে-ভয়ে সামনের দিকে আঙুল তুলে দেখাল — এত তারা!

'শিট-আইস, এখনও গলেনি। বরফের ওপরে তারার আলো রিফ্লেক্ট করছে। ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে চলে আসুন।'

ভোরের আলো ফুটতে যখন আর একটু দেরি, তখন ওরা ছোটো একটা বুগিয়ালের প্রান্তে পৌঁছোল। চতুর্দিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা সেই তৃণভূমির ঠিক মাঝখানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে স্টান্টেড-রডোডেনড্রনের ঘন বন। দিনের পর দিন অবিরাম ব্লিজার্ডের ঝাপটায় গাছগুলো বেঁটে বামন হয়ে গেছে। সেই বনের ধারেই ছিল একটা ঘর। ঘরটার কাঠের দেয়াল, শ্লেটপাথরের ছাদ। ঘরের দরজার শেকল খুলে লোকটা অরিত্রকে ডাকল, 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

দরজাটা নীচু। অরিত্র মাথা হেট করে ঘরের ভেতরে ঢুকল। ঘরের এক কোনায় পাথর-টাথর দিয়ে একটা ফায়ারপ্লেসের মতন জিনিস বানানো হয়েছিল। সেখানে তখনও ধিকধিক করে জ্বলছিল অঙ্গারের স্তূপ। বন্ধ ঘরের মধ্যে আলো বলতে ওইটুকুই। সেই আলোতে অরিত্র দেখল মেঝের একপাশে শুকনো মুথাঘাসের গদির ওপরে পশুর চামড়া বিছানো রয়েছে। বোঝা যায়, এ ঘরে বসা-শোয়া সব ওখানেই। অন্য আরএক কোণে পাথরের উনুন আর কিছু বাসনপত্র। দেয়ালে আড়াআড়িভাবে টাঙানো রয়েছে দুটো বন্দুক। মোটামুটিভাবে ঘরটার মধ্যে দেখার জিনিস বলতে এইটুকুই।

লোকটা অরিত্রকে বলল, 'আরাম করে বসুন।'

অরিত্র রুক্ষভাবে বলতে চেয়েছিল, 'বসতে আসিনি। যে-কথা দিয়েছিলেন সেটা রাখুন।' কিন্তু বলতে পারল না। ও বুঝতে পারছিল, লোকটার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই ওর ভেতরে একটা ভাঙচুর শুরু হয়েছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, এই পৃথিবী তার চেনা পৃথিবী নয়। এই জীবনটাও যেন ঠিক তার আগের জীবনের অংশ নয়। অন্য কোথাও, অন্য এক অরিত্রের জীবনযাপন করতে শুরু করেছে সে। তার কনফিডেন্স টলে গিয়েছিল।

অতএব অরিত্র কিছু না বলে, পা ভাঁজ করে পশুর চামড়ার আসনের ওপরে বসল।

লোকটা ইতোমধ্যে অঙ্গারের স্তূপ থেকে আগুন নিয়ে উনুন ধরিয়ে ফেলেছিল। এবার উনুনের আগুনে একটা বড়ো সসপ্যান চাপিয়ে জল ফুটতে দিল।

অরিত্র অন্যমনস্কভাবে ঘাসের ওপরে বিছিয়ে রাখা চামড়াটার ওপরে হাত বোলাচ্ছিল। তার মনে পড়ছিল নাইটির ছোটো হাতার বাইরে বেরিয়ে থাকা তার মায়ের মাখনের মতন বাহুদুটোর কথা। এইরকমই গোলাপি রঙের ত্বক ছিল মায়ের হাতে। এইরকমই খুব সূক্ষ্ম সোনালি রোম, মসৃণ। চামড়াটার ওপরে হাত বোলাতে ভালো লাগছিল তার। ভাবছিল, এটা কীসের চামড়া?

হঠাৎই তার খেয়াল হল, লোকটা উনুনের সামনে থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। অরিত্র তাই দেখে তাড়াতাড়ি হাতদুটো গুটিয়ে নিল।

দুটো মগে গরম কোনো পানীয় নিয়ে লোকটা অরিত্রর পাশে এসে বসল। সঙ্গে একটা প্লেটে সেঁকা বাদামজাতীয় কিছু ফল। খিদে আর তেষ্টা দুটোই পেয়েছিল অরিত্রের। সে একমুঠো বাদাম মুখের মধ্যে পুরে চিবিয়ে গিলে ফেলল। অচেনা স্বাদ, তবে খেতে খারাপ নয়। তারপরে পানীয়ের মগে চুমুক দিল। চা নয়, কফিও নয়; কিন্তু এটার স্বাদও অপূর্ব।

লোকটা ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন বলল, 'লোকালয়ে যাই না, বুঝলেন। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালো লাগে না। আর তার প্রয়োজনই বা কী? যা কিছু প্রয়োজন এই পাশের বনজঙ্গল থেকেই পেয়ে যাই। এই চা-পাতার মতন গাছের পাতা, এই বাদাম, সবই এক জলাভূমির তীরে খুঁজে পেয়েছি।'

কথা চালাবার জন্যেই অরিত্র জিজ্ঞেস করল 'কাল যখন আমার সঙ্গে দেখা হল, তখন কোথায় গিয়েছিলেন তাহলে?।'

লোকটা ক্যানভাসের স্লিং-ব্যাগের মুখের দড়ির ফাঁসটা খুলে ঝাড়া দিতেই ভেতর থেকে একটা মরা তিতিরপাখি ধপ করে মেঝের ওপরে পড়লো। লোকটা বলল, 'যে-রাস্তাটার ধারে আপনাকে দেখতে পেলাম, ওখানে ন'মাসে ছ'মাসে আপনার মতন কোনো পুরুষমানুষ এসে বসে ঠিক ওই পাইনগাছের নীচটাতেই। তাদেরও সঙ্গে থাকে বিষ কিংবা ঘুমের ওষুধ। না হলে নতুন ব্লেড। খেলনাটা সবার সঙ্গে থাকে না অবশ্য। তবে ছবির বই থাকে। কিংবা ঘুমপাড়ানি গানের ক্যাসেট-প্লেয়ার। আমি তাদের এখানে নিয়ে আসি।'

অরিত্র বুঝতে পারছিল, লোকটার কথা শুনতে-শুনতে তার কেমন যেন ঘোর লেগে যাচ্ছে। না হলে এইমাত্র ও যে-কথাটা বলল, তাতে তার অবাক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কই, হচ্ছে না তো! তবু সে কোনোরকমে প্রশ্ন করল, 'কেন? নিয়ে আসেন কেন?।'

'আনবো না?', প্রতিপ্রশ্ন করল লোকটা। ''আপনি যেমন গর্ভ খুঁজছেন, তেমনই গর্ভও তো বীজ খোঁজে। বিশেষত মাসিকের পরের ওই উর্বর সময়টায়। আর দু-দিন এখানে থাকুন। সেই 'হিট' আপনিও ফিল করতে পারবেন।'

অরিত্র কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারল না। বোকার মতন হাসল। লোকটা কেমন যেন করুণ গলায় যোগ করল — 'ও আমাকে সেই বীজ খুঁজতে পাঠায়। তাই যেতে হয়।'

কার গর্ভ, হিট, কার জন্যে বীজ আর কেই বা লোকটাকে খুঁজতে পাঠায়, কিছুই জানা হল না অরিত্রর। মানে সে নিজেই জানতে চাইছিল না। মাথার ভেতরটা ক্রমশ শূন্য হয়ে আসছিল। দুপুরবেলায় তিতিরের মাংস দিয়ে রুটি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন ঘুম ভাঙল, দেখল লোকটা ঘরে নেই।

অরিত্র একাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আকাশে তখনও শেষ-বিকেলের একটু আলো ছিল। অরিত্র আশেপাশে পায়চারি করতে করতে হঠাৎই দেখল, ঘরটার পেছনে একটা বিরাট মেশিন পড়ে আছে। এই তৃণভূমির মধ্যে খুবই বেমানান সেটা। এমন মেশিন এখানে কোথা থেকে এল? কেনই বা এল?

মেশিনটা বিরাট, কিন্তু জটিল নয়। অথচ দেখলেই বোঝা যায় অসম্ভব কঠিন কোনো কাজ করার জন্যে ওটার জন্ম হয়েছিল। অনেকটা হাতির শুঁড়ের মতন সহজ এবং শক্তিশালী; এখন মাটির মধ্যে অর্ধেকটা ঢুকে

গেছে। কতবছর ধরে এখানে পড়ে আছে কে জানে! কী ধাতু দিয়ে ওটা তৈরি, তাও বুঝতে পারল না অরিত্র। কোনো মেটালের গায়ে কি এমন কমলা আভা থাকে? কোথাও মরচেও পড়েনি এতটুকু।

পশ্চিমের একটা তুষারশৃঙ্গের পেছন থেকে হঠাৎই সার্চলাইটের মতন রুপোলি একটা আলোর বিম এসে বুগিয়ালটাকে আলোয় ভাসিয়ে দিল। অরিত্র দেখল, যেন পৃথিবীর থেকেও বড়ো একটা চাঁদ আস্তে-আস্তে পাহাড়ের পেছন থেকে বেরিয়ে আসছে। ঠিক তখনই লোকটা ওর পেছন থেকে বলে উঠল, 'কাল পূর্ণিমা। কাল সকালে এক জায়গায় নিয়ে যাব আপনাকে'।

'আর গর্ভ? জরায়ুর জলের বিছানায় ফেরা?' — অরিত্র জিজ্ঞেস করল।

'পূর্ণিমা মানে তো তাঁর পিরিয়ডের শেষ দিন। কাজেই ধরুন পরশুই আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে।'

'কার পিরিয়ড? কে ইচ্ছে করলে?।'

লোকটা একটু বিরক্ত গলায় বলল, 'কেন? আপনাকে মহাজাগতিক মাতৃকার কথা বলেছিলাম না?।'

পরদিন খুব ভোরে ওরা দুজনে বেরিয়ে পড়ল। অরিত্র আর সেই লোকটা। স্টান্টেড রডোডেনড্রনের বনের মধ্যে দিয়ে লোকটাকে অনুসরণ করে হাঁটছিল অরিত্র। একটা জিনিস ও পরিষ্কার বুঝতে পারছিল — ওরা চলেছে একটা পায়ে চলা রাস্তা ধরে। এই নির্জন প্রান্তরের মধ্যে বন। সেই বনের মধ্যেও মানুষের পায়ে-পায়ে একটা সরু রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে! এখানে কি অনেকদিন ধরে মানুষ আসছে? কেন আসছে? কী আছে এখানে? লোকটাকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল অরিত্র। তার মনে হল, খুব শিগগিরই সে সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। লোকটাই তাকে বলবে।

হাঁটতে-হাঁটতে কিছুক্ষণ পরে হঠাৎই একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে গেল ওরা। প্রায় একটা ফুটবল মাঠের আয়তনের সেই জমিটায় রডোডেনড্রনের গাছ তো দূরের কথা, একটা ঘাস অবধি ছিল না কোথাও। পায়ের তলায় ঝামাপাথরের মতন পোড়া মাটি আর সামনে একটা ছোটো টিলার মতন উঁচু পাথর। একটাই দানবাকার পাথরের চাঁই — যাকে ইংরিজিতে বলে 'মনোলিথ'।

পাথরটা অদ্ভুত। প্রথমত, তার মসৃণতা দেখে মনে হচ্ছিল মাছি বসলেও পিছলে যাবে আর দ্বিতীয়ত, জড়বস্তুর মধ্যে এমন নিখুঁত দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য দেখা যায় না। একটা গভীর খাঁজের দুপাশে একেবারে সম-আয়তনের দুটো চোখের জলের ফোঁটা যদি কল্পনা করা যায় তাহলে যেমন দেখাবে, পাথরটার শেপ ঠিক সেইরকম। দুটো 'টিয়ার-ড্রপ' পাশাপাশি মিশে একটা পানপাতার গড়ন ধরেছে। অবশ্য পানপাতার মধ্যে ত্রিমাত্রিকতা নেই, তাই তানপুরার খোল বললে আরও ভালো বোঝা যাবে। ওইরকমই সুন্দর ডৌল টিলাটার।

'ওটা কী? আর এই জায়গাটার এমন পুড়ে যাওয়া চেহারা কেন?', জিজ্ঞেস না করে পারল না অরিত্র।

লোকটা পাথরটার দিক থেকে চোখ না সরিয়েই উত্তর দিল, 'যদি বলি ওই পাথরটার জন্যেই জায়গাটার এমন দুর্দশা, তাহলে কি বুঝতে পারবেন?।'

'উল্কা? এত বড়ো!' — অরিত্রর গলায় অবিশ্বাসের সুর।

'একদম ঠিক বলেছেন'। কথাটা বলে লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। অরিত্র অবাক হয়ে দেখল, তাঁর ইস্পাত-নীল চোখের তারায় যেন বিষাদের ছাপ। সে আবার বলল, 'উল্কাটা যখন পড়েছিল তখন এত বেশি উত্তাপ ছিল যে, ওটা মাটি ছোঁয়ার অনেক আগেই এই পুরো তৃণভূমির সমস্ত গাছপালা আর ঘাস দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছিল। সমস্ত জন্তু পুড়ে মরে গিয়েছিল। কত বছর হল, কুড়ি-হাজার? তাই হবে।'

অরিত্র মুচকি হেসে বলল, 'এমন করে বলছেন, মনে হচ্ছে আপনি যেন স্বচক্ষে উল্কাটাকে খসে পড়তে দেখেছিলেন'।

'দেখেছিলাম বই কি।'

আর শুধু চোখে নয়; লোকটার গলার স্বরেও এবার বিষণ্ণতা ঘনিয়ে উঠল। সে বলে চলল, 'সত্যি কথা বলতে কী আমিও ওই উল্কাটার সঙ্গে সঙ্গেই এখানে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমাকে ও মহাকাশ থেকেই ধরে এনেছিল। সেই থেকে আমি ওর ক্রীতদাস— স্লেভ।'

'কে? কার কথা বলছেন আপনি? কার স্লেভ?'

'ওই উল্কাপাথরটার কথা বলছি। কুড়ি হাজার বছর ধরে ওই আমার মালকিন। আমার অন্নদাত্রী। মহাজাগতিক মাতৃকা।'

অরিত্র বুঝতে পারছিল, এই লোকটা ঠগ না হলেও উন্মাদ তো বটেই। ওর ওপরে আর ভরসা করা যাবে না। তাকে আবার নতুন করে আত্মহত্যার উপায় ভাবতে হবে।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে পাথরটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল লোকটা। তারপর হঠাৎই বলল, 'চলুন, এবার ফেরা যাক'।

'আমাকে কি এই পাথরটা দেখাবার জন্যেই নিয়ে এসেছিলেন?' প্রশ্ন করল অরিত্র।

লোকটা বলল, 'হ্যাঁ। এর পর আপনাকে এখানে একাই আসতে হবে। তাই রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে গেলাম। চলুন।'

ফেরার পথে একজায়গায় অরিত্র দেখল, ফ্যাকাশে লাল জলের একটা সরু ধারা মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। সে বলল, 'জলের রংটা কি অদ্ভুত না? মনে হয় মাটিতে হেমাটাইট আছে।'

লোকটা বিরক্ত গলায় বলল, 'এখনও আপনি সব কিছু আপনাদের সামান্য বিজ্ঞানের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করবেন? আপনাকে বলেছিলাম না, মহাজাগতিক মাতৃকার ঋতুচক্রের আজ শেষ দিন।'

সেই রাতে লোকটা মাংস রান্না করেছিল। বলল তো বুনো শুয়োরের মাংস। অপূর্ব স্বাদ। এত নরম আর এত মিষ্টি কোনো মাংস জীবনে খায়নি অরিত্র।

কাঠের সিলিং থেকে একটা লোহার হুক দিয়ে শুয়োরের দাবনার টুকরোটা ঝোলানো ছিল। হলুদ মাখানো বেশ পুরুষ্টু একটা টুকরো। অরিত্রর মনে হল, মানুষের ঊরুর সঙ্গে খুব একটা তফাত নেই। লোকটা যখন পুরো মাংসটাই কড়াইতে চাপাচ্ছিল, তখন সে আপত্তি করে বলেছিল, 'পুরোটা খরচা করছেন কেন? আমি খুব অল্প খাই। অর্ধেকটা রেখে দিন।'

তাতে লোকটা বেশ ফুর্তিবাজের মতন বলেছিল, 'এইটুকু লাক্সারি আজ করতেই পারি। কালকেই তো আবার শুয়োর শিকার করব। চামড়া, মাংস সবই আবার পেয়ে যাব।'

'শুয়োরের চামড়া! কাজে লাগে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল অরিত্র।

লোকটা মাংসের ঝোলে কীসব সুগন্ধী হার্ব-টার্ব মেশাতে-মেশাতে বলেছিল, 'লাগে বই কি। ওই যে চাদরটার ওপরে বসে আছেন, এই যে আমার পোশাক — সবই তো শুয়োরের চামড়া দিয়ে বানানো।'

অরিত্রর বিশ্বাস হয়নি। সে কিছুদিন একটা লেদার-এক্সপোর্ট ফার্মে চাকরি করেছিল। তখনই শুনেছিল, শুয়োরের চামড়া থেকে ঘন আর শক্ত লোম ছাড়ানো এক অসম্ভব ব্যাপার; তাই ওই চামড়া দিয়ে কোনো কাজ হয় না। সে যাই হোক, মাংসটা খেতে খাসা হয়েছিল এবং অনেকটা খেয়ে ফেলেছিল বলেই অরিত্র সেই রাতে ঘুমিয়েও পড়েছিল তাড়াতাড়ি।

ঘুমটা যখন ভাঙল তখনও ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার। ফায়ার-প্লেসের অঙ্গারের আভা ছাড়া আর কোনো আলো ছিল না। সেই অল্প আলোতে কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছিল না। লোকটা অন্যদিকে ঘুরে শুয়েছিল। অরিত্র সাবধানে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের একমাত্র জানলাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। জানলার পাল্লাটা সামান্য ফাঁক করে দেখল, তখনও প্রায় বৃত্তাকার চাঁদটি আকাশের এক কোণে ঝুলে রয়েছে। পূর্ণিমার পরে প্রথমার চাঁদ।

অরিত্র চিন্তা করল, এমন অসময়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল কেন? উত্তরটা বোধহয় সে আন্দাজ করতে পারছিল। আসলে তখন প্রায় সবকটা ইন্দ্রিয় দিয়ে অরিত্র অনেকগুলো অস্বাভাবিকতাকে স্পর্শ করতে পারছিল। তবু ব্যাপারটাকে ভালো করে বোঝবার জন্যে সে ঘরের দরজা খুলে বাইরে এল। জ্যাকেটের হুডটা মাথার ওপরে তুলে দিয়ে, সেই পুরোনো মেশিনটার পাশ কাটিয়ে স্টান্টেড রডোডেনড্রনের বনের দিকে এগিয়ে গেল।

হ্যাঁ, কোনো ভুল নেই, মাটিটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। ভূমিকম্প? না। ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা রয়েছে অরিত্রর। ভূমিকম্পে মাটি দুলে ওঠে। এখন মাটি দুলছে না — মোচড়াচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ সময়ের ব্যবধানে একবার করে যেন মুচড়ে উঠছে মাটিটা আর তখনই অনেক দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে। যেন কেউ তীব্র আশ্লেষে আওয়াজ করছে 'উমমম! আঃ! আহহ! উমমমম!'

নারীর কণ্ঠস্বর।

এরকমই কত অন্ধকার রাতে, জয়িতার নগ্ন পিঠে হাত রেখে অরিত্র এই মোচড় অনুভব করেছে। কতবার কামাতুরা জয়িতা তার বুকের পশমে মুখ ডুবিয়ে ঠিক এইভাবে গভীর আশ্লেষে তাকে ডেকেছে — 'উমমম! আঃ! আহহ! উমমমম'।

এরপর আর কিছুই অরিত্রর হাতে রইল না। এক মায়াপাশ তাকে টেনে নিয়ে চলল — যেভাবে হরিণকে টানে অজগরের চোখ।

কতক্ষণ ধরে যে রডোডেনড্রন-বনের ভেতর দিয়ে সে হেঁটেছিল, তা জানে না অরিত্র। হঠাৎই বনের যবনিকা সরে গিয়ে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই উল্কাপাতের মাঠ। মরা জ্যোৎস্নায় বৃত্তাকার জমিটাকে মনে হচ্ছিল এক রঙ্গমঞ্চ, যেখানে অভিনেতা বলতে অরিত্র একা।

না, আরএকজন ছিল। সেই বিশাল উল্কা-পাথর।

পাথরটা এখন স্পষ্টতই জীবন্ত এবং অনুভূতিশীল। ঘোরলাগা চোখে অরিত্র পাথরটার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গেই গাড়োয়াল-হিমালয়ের মধ্যরাতের শৈত্যকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, এক আশ্চর্য উষ্ণ তরঙ্গ তাকে জড়িয়ে ধরল। অরিত্রর মনে পড়ল, ওই লোকটা একবার 'হিট'-এর কথা বলেছিল। এই কি সেই কামজ্বর? অরিত্র অবাক হয়ে দেখল, পাথরটা ঘামছে।

পাথরটাকে একটা পাক দিয়ে অরিত্র এবার উলটোদিকে গিয়ে দাঁড়াল। আগের দিন সকালে যখন লোকটার সঙ্গে এসেছিল, তখন এদিকটায় আসেনি। আজ কেন যে এত আসতে ইচ্ছে হল, কে জানে। কী যেন এক নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখার আশায় অরিত্র তখন টিন-এজারের মতন ছটফট করছিল।

দেখলও অরিত্র। দু-চোখ ভরে দেখল, পেছনদিকের সেই মসৃণতা, সেই দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য এদিকেও মজুত। এইদিকে কালোপাথরের নিটোল দুটি স্তম্ভ একটু আনত-ভাবে মাটি থেকে ওপরের দিকে উঠে গেছে। আকারে-প্রকারে দুটি স্তম্ভই একেবারে একরকম। আর সেই দুই স্তম্ভ মাটিতে যেখানে মিশেছে সেখানে এক আশ্চর্য পাথরের ব্লক।

ব্লকটা এইজন্যেই আশ্চর্য যে, আকৃতিতে সেটি এক নিখুঁত সমবাহু ত্রিভুজ, একটা উলটানো ত্রিভুজ, যার ভূমি ওপরের দিকে আর শীর্ষ নীচে। আরও আশ্চর্য যে, পুরো উল্কাপাথরটার গায়ে আর কোথাও এক-কুচি শ্যাওলা না জন্মালেও, এই ত্রিভুজাকৃতি ব্লকটা একরকমের গাঢ় বাদামি গুল্মের ঘন আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে গেছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, যদি ব্লকটাকে একটা ত্রিভুজ বলেই ধরা হয়, তাহলে তার ঠিক মধ্যরেখা বরাবর, শীর্ষবিন্দু থেকে ভূমির দিকে অনেকদূর অবধি খাড়া উঠে গেছে একটা সরু ফাটল।

অরিত্রর মনে হচ্ছিল সে যেন একটা লোহার পেরেক আর ওই ফাটলটা বিদ্যুৎ-চুম্বক। অসম্ভব জোরালো এক আকর্ষণে অরিত্র আরও কিছুটা এগিয়ে গেল ওইদিকে আর তখনই সে দেখতে পেল ফাটলটার নীচের দিকে একটা সংকীর্ণ গুহামুখ।

সে আর কিছু দেখার কিংবা ভাবার আগেই পাথরটা একবার প্রবলভাবে মুচড়ে উঠল, এবং অরিত্র আছড়ে পড়ল সেই গুহার মুখে। এবং গুহার ঢাল বেয়ে অনেকটা নেমে গেল সে।

স্পন্দমান পাথরের কথা আগে কখনও শোনেনি অরিত্র। পিচ্ছিল এবং গোলাপি পাথরের কথাও শোনেনি। অথচ সেই-মুহূর্তে তার শরীরটা গুহার দেয়ালের রাশি-রাশি পিচ্ছিল, গোলাপি-পাথরের ছন্দোবদ্ধ সংকোচন-প্রসারণে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছিল গভীরে, আরও গভীরে।

একটুও ভয় করছিল না অরিত্রর। চেতনার শেষ রশ্মিটুকু দিয়ে সে বুঝতে পারছিল, অদ্ভুত লোকটা তার কথা রেখেছে। সে অবশেষে ফিরে যাচ্ছে মাতৃগর্ভে।

একসময় সেই সরু টানেলের শেষে একটা কপাট দেখতে পেল অরিত্র। যেন তার আসার খবর পেয়েই খুলে গেল সেই কপাট। দমচাপা দেয়ালের অন্তিম সংকোচন অরিত্রকে কপাটের ওদিকে এক প্রশস্ত কুঠুরিতে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। কুঠুরিটার গড়ন ন্যাসপাতি-ফলের মতন। অরিত্র শুয়ে ছিল ফলের বোঁটার দিকটায়। উলটোদিক থেকে আবার দুটো সুড়ঙ্গ বেরিয়ে কোথায় চলে গেছে কে জানে।

এখন তার শরীরের ওপর থেকে দেয়ালের চাপ সরে গেছে। এখন তাকে নিজের চেষ্টায় ওই সুড়ঙ্গদুটোর মধ্যে একটায় ঢুকে পড়তে হবে। কোনটায়? অরিত্রর মন বলছিল ডানদিকে। কী হবে সেখানে ঢুকলে? তা জানে না অরিত্র। সে শুধু জানে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। কীভাবে যাবে?

ন্যাসপাতির মতন এই কুঠুরিটা খুব পেছল। এর মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যেতে হবে সাঁতার কেটে। অসুবিধে নেই, ভাবল অরিত্র। এখন তো তার হাত নেই, পা নেই। রয়েছে শুধু রাক্ষুসে টোপরের মতন বিরাট একটা মাথা আর সেই মাথার পেছনে ব্যাঙাচির লেজের মতন শরীর। শরীরটাকে ডাইনে-বাঁয়ে নাড়াতেই সে সাঁতার কেটে অনেকটা এগিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ সাঁতার কাটার পরে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল অরিত্র। ডানদিকের সুড়ঙ্গটায় পৌঁছোতে তখনও অনেক দেরি। হঠাৎই অরিত্র বুঝতে পারল, জেলির মতন ওই পিচ্ছিলতাকে তার শরীর শুষে নিচ্ছে। শুষে নিচ্ছে একধরনের পুষ্টি, যার ফলে তার সমস্ত ক্লান্তি কেটে যাচ্ছে।

যেন অনন্তকাল এমন করে সাঁতার কেটে চলার পরে অরিত্র দেখতে পেল, সে সুড়ঙ্গের মধ্যে পৌঁছে গেছে আর সেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছে বিশাল এবং স্বচ্ছ এক ডিম্বাণু। দেবতার ছেলেমেয়েদের ফুঁ দিয়ে ওড়ানো সাবানের বুদবুদের মতন রামধনু রঙা সেই কোশটার মধ্যে পাক খাচ্ছিল অজস্র ক্রোমোজোমের রঙিন স্প্যাগেটি। অরিত্র একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আঃ! এবার ঘুমোব'। তারপর সে ডিম্বাণুর নরম আবরণের মধ্যে নিজের টোপরের মতন মাথাটা ঢুকিয়ে দিতেই বুদবুদের জলে তার শরীরটা গলে মিশে গেল।

গুহার বাইরে একটা পাথরের ওপরে পা ছড়িয়ে বসে ছিল সেই লোকটা। সূর্য এখন মাঝ আকাশে। অরিত্র তার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর প্রায় বারো ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। কুড়ি হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় লোকটা জানে, এই সেই সময়; এখনই সতর্ক থাকতে হবে। সবে জন্মালে কী হবে? মায়ের পেট থেকে পড়েই মাদারচোদরা বিদ্যুতের মতন ছুটতে পারে। সে বন্দুকটা কোল থেকে তুলে নিয়ে সেফটি-ক্যাচে চাপ দিল।

তার আন্দাজে ভুল ছিল না। হঠাৎই ফাটলের নীচের গুহাটা থেকে একটা বুনো শুয়োরের বাচ্চা ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এল। গোলাপি নির্লোম শরীর, উজ্জ্বল কালো দুটো চোখ, ছুঁচলো কান আর চেরা খুর। গুহার ভেতর থেকে বাইরের রোদে বেরিয়ে বোধহয় বাচ্চাটার চোখে ধাঁধা লেগে গিয়েছিল, তাই সে এক মুহূর্ত থমকাল। বাতাসের গন্ধ শুঁকল। ছুঁচলো দুই কানের পাতা এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়ে বুঝে নিতে চাইল আশেপাশে কেউ আছে কি না। এবং ঠিক তখনই ফায়ারিং-এর আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা তৃণভূমি।

শুয়োরের বাচ্চাটা চার-পা ওপরে তুলে লটকে পড়ল জমিতে। লোকটা পাথরের আসন থেকে নেমে এসে, পা দিয়ে ঠেলা মেরে দেখল, বাচ্চাটা পুরোপুরি মরেছে কিনা। তারপর আলগোছে সেটাকে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে মাটিতে থুতু ফেলে বলল, 'নরকের জীব শালারা। মায়ের সঙ্গে সেক্স করে।'

ফেরিওলা

প্রতিদিন সকাল সাতটা নাগাদ ওই ফেরিওলা আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁক পেড়ে চলে যায়। ভীষণ তীব্র, ভীষণ ছেদহীন সেই চিৎকার। একটুও না থেমে, একবারও দম না নিয়ে, লোকটা গলার শিরা ফুলিয়ে চ্যাঁচায় 'পুরানো হারমোনিয়াম, কম্পিউটার, ল্যাপটপ বিক্রি আছে। গ্রামাফোন, ঘড়ি, পাম্পমেশিন বিক্রি আছে।'

আরও অনেক জিনিসেরই নাম বলে। আমি দু-কানে হাত চাপা দিয়ে বসে থাকি বলে সব কিছু ভালো করে শুনতে পাই না।

আচ্ছা, ওকে কি ফেরিওলা বলা যায়? ও তো কিছু ফেরি করে না; মানে বিক্রি তো করে না কিছুই। ও কিনতে আসে। যেমন পুরনো খবরের কাগজ কেনার লোক আসে, সেইরকমই।

তবু ঠিকঠাক প্রতিশব্দের অভাবে ওকে আমি ফেরিওলাই বলি।

দিনের মধ্যে ওই একটা সময়েই বাবার শরীরে একটু সাড় দেখতে পাই— যখন ওই লোকটা চিৎকার করতে-করতে এই তালপুকুর বস্তির রাস্তা পেরিয়ে স্টেশন রোডের দিকে চলে যায়। গত তিনবছর ধরে যে-মানুষটা মড়ার মতন বিছানায় পড়ে আছে, সেও যেন তখন একটু নড়েচড়ে ওঠে। মুখে একটু কাতর শব্দ করে। এমনকি বন্ধ চোখের পাতাদুটোও যেন অতিকষ্টে খুলবার চেষ্টা করছে বলে মনে হয়।

ফেরিওলা একটু দূরে চলে গেলে তালপুকুর বস্তিতে আবার জীবন ফিরে আসে। আবার কাক ডাকে, কুকুর ডাকে। বস্তির কলতলা থেকে আবার ঝগড়ার শব্দ শোনা যায়। রিকশার হর্ন, মোটর-সাইকেলের গর্জন, চন্দন সাহার লেদ-কারখানার আওয়াজ— এতক্ষণ ফেরিওলার গলার দাপটে যেসব শব্দ মুলতুবি ছিল — সবই আবার জেগে ওঠে। মাথা চাড়া দেয়। এখন ওইসব স্বাভাবিক শব্দই রাজত্ব করবে। আবার তিন-দিন কিংবা পাঁচ-দিন বাদে ফিরে আসবে ফেরিওলা। তখন আবার আতঙ্কে চুপ করে যাবে তালপুকুর বস্তি।



'আতঙ্ক'। সত্যিই আতঙ্ক।

আমি আগে ভাবতাম আমি একাই বুঝি ভয় পাই। তা নয়। কদিন আগে সোনারপুর থেকে রাঙামাসি বাবাকে দেখতে এসেছিল। একরাত ছিল আমাদের ঘরে। সকালবেলায় যখন বাড়ি ফেরার জন্যে তৈরি হচ্ছে, ঠিক তখনই ওই ফেরিওলা 'পুরোনো হারমোনিয়াম, ল্যাপটপ, টাইপ-রাইটার' এইসব বলে চিৎকার করতে-করতে বস্তির রাস্তায় ঢুকল আর আমার চোখের সামনে রাঙামাসির মুখটা ভয়ে নীল হয়ে গেল। লোকটা ডাকতে-ডাকতে চলে যাওয়ার পর রাঙামাসি কপালে দু-হাত ঠেকিয়ে বলল, 'দুর্গা দুর্গা! কি অলক্ষুণে ডাক রে বাবা! তোরা সহ্য করিস কেমন করে সোমু?।'

তারপর বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কষ্ট হচ্ছে, জামাইবাবু?।'

কষ্ট যে হচ্ছিল সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। বাবার মুখের চামড়াটা এমনিতেই ফ্যাকাশে। সেই-মুহূর্তে যেন আরও ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। একেবারে ব্যাঙের পেটের মতন সাদা আর ঘামেভেজা। ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপছিল।

শান্তিনিকেতনি ঝোলাটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে রাঙামাসি বাবার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'ইস, দ্যাখ তো, ভয়ের চোটে পেচ্ছাপ করে ফেলেছে। হারামজাদা ফেরিওলাটাকে তোর পাড়ার মধ্যে অ্যালাউ করিস কেন?।'

আমি হাসতে-হাসতে বললাম, 'প্রত্যেকবারই করে। ওই ফেরিওলাটার ডাক শুনলেই বাবা ভয়ে পেচ্ছাপ করে ফেলে।'

রাঙামাসি খুব অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই হাসছিস কেমন করে বুঝতে পারছি না। এটা কি একটা হাসির মতন বিষয় হল? যাই হোক, তোর জীবন, তুইই ভালো বুঝবি কেমন করে কাটাবি। দিদি চলে যাওয়ার পর গুরুজন বলতে তো ওই মানুষটাই আছেন। উনি চলে গেলে আর তোদের এখানে আসতে পারব বলে মনে হয় না। দরজাটা বন্ধ করে দে। আমি চললাম'।

রাঙামাসি চলে যাওয়ার পরে বাবার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বললাম, 'তুমি মরতে পারছ না কেন, বাবা? এবার চলে গেলেই তো পারো। তোমার জীবনে আর আছেটা কী?।'

বাবা অতিকষ্টে চোখের পাতাদুটো খুলে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। খুব টেনে টেনে, খুব আস্তে আস্তে বলল, 'ভয় করে।'

আমি বললাম, 'ভয় আবার কীসের? তোমার বউ তো কী সুন্দর তিনবছর আগেই চলে গেল। কই, তার তো ভয় করেনি! তোমার ইচ্ছে করে না মায়ের পাশে গিয়ে বসতে?।'

বাবা চোখদুটো আবার বুজিয়ে ফেলল। দু-চোখের কোল দিয়ে দুটো জলের ফোঁটা গড়িয়ে নেমে এল। আমি বললাম, 'মরো, মরো। এবার মরো। আমি একটু এই বস্তির ঘরটা ছেড়ে বেরোই।'

তারপরেও আরও ছ'মাস কেটে গেছে। এই ছ'মাসে বিশেষ কিছুই বদলায়নি, শুধু রাঙামাসি মারা গেছে। আর ওই ফেরিওলার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেছে।

হয়েছিল কী, একদিন ওর ওইরকম চিৎকার শুনে কানে হাত চাপা দিয়ে বসে আছি। বসে থাকতে থাকতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, 'তুই কী খাস রে শালা? গলায় এত জোর!'

খুব জোরে বলে ফেলেছিলাম কি কথাগুলো? মনে তো হয় না। মানুষ স্বগতোক্তি আর কত জোরে করবে! তবু পরক্ষণেই দেখি আমাদের জানলায় সেই ফেরিওলাটার মুখ। আমি তাকাতেই সে দাঁত বার করে হাসল। লাল লাল দাঁত। বলল, 'কী খাই জিজ্ঞেস করছেন? রক্ত খাই, রক্ত।'

আমি বললাম, 'ইয়ার্কি মেরো না।'

সে বলল, 'তোমার খাওয়া জুটেছে?।'

হঠাৎ আপনি থেকে তুমিতে নেমে গেল দেখে আমি প্রথমে একটু আহত হয়েছিলাম। তারপর যখন খেয়াল করে দেখলাম লোকটা আমার থেকে বয়সে অনেকটাই বড়ো, তখন আর অতটা খারাপ লাগল না। বয়স হবে ওর পঞ্চাশের কাছাকাছি। লম্বা-চওড়া চেহারা। গায়ের রং কালো। কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো দিয়ে যেন তেল গড়িয়ে নামছে। একটা খাটো-ঝুলের কালো ট্রাউজার আর খাকি শার্ট পরে ছিল।

ওর প্রশ্নের উত্তরে বললাম, 'না, এখনও খাইনি। খেয়ে নেব পরে।'

'কী করে খাবে? পকেট তো ঢুঁ-ঢুঁ। পাড়ার দোকান ধারবাকিতে জিনিস দেওয়া বন্ধ করেছে। তাহলে খাবেটা কী? বাতাস?।'

আমি গুম মেরে বসে রইলাম। কথাগুলো ভুল বলেনি; কিন্তু শালা জানল কেমন করে? সত্যিই লকডাউনের পর থেকেই আমার জেরক্সের দোকান বন্ধ। খেতে পাচ্ছি না।

লোকটা রাস্তার দিকের জানলা থেকে ঘুরে সটান আমাদের দরজার দিকে চলে এল। তারপর কিছু না বলে-কয়েই ভেজানো পাল্লাদুটো খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে মেঝের ওপরে উবু হয়ে বসল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী হল?।'

'তোমাকে কিছু খাওয়ানো যায় কিনা দেখছি। ওটা কে? বাপ?।'

আমি ঘাড় হেলালাম।

'মরছে না?।'

আমি আবার ঘাড় হেলালাম।

'মরবে। কেমন করে মরবে আমার জানা আছে'।

এই বলে লোকটা আমাদের চৌকির তলায় মুণ্ডুটা ঢুকিয়ে দিল।

আমাদের একঘরের সংসারে একমাত্র শয্যা ওই কেরোসিন-কাঠের চৌকি। মা বেঁচে থাকতে মা-বাবা দুজনেই ওটার ওপরে শুত। এখন বাবা একা শুয়ে থাকে। আমি শুই মেঝেতে বিছানা পেতে।

চৌকির নীচটা চির-অন্ধকারের রাজ্য। ওখান থেকে মাঝেমাঝে ঘিয়ে-রঙের খোলস-ছাড়া আরশোলা বেরিয়ে আসে। কেন্নো আর সবুজ মাকড়সা বেরিয়ে আসে। ডুবে যাওয়া জাহাজের খোলের মতন ডাঁই হয়ে কতকিছু যে ওখানে জমে আছে তার হদিস আমি কোনোদিন রাখিনি। সকালে বিকেলে ঘরটা দু-বার ঝাঁট দিই ঠিকই, কিন্তু আমার ঝাঁটা অতদূর পৌঁছোয় না।

লোকটা কি বেড়ালের মতন অন্ধকারেও দেখতে পায়? কী জানি! একবার চৌকির নিচে দৃষ্টি মেলে দিয়েই বলল, 'একটা পুরোনো হারমোনিয়াম আছে দেখছি। ওটা নিয়ে যাচ্ছি।' এই বলে আমার মতামতের তোয়াক্কা না করেই, লম্বা হাত বাড়িয়ে হারমোনিয়ামের বাক্সটা বার করে আনল। আমার মনে পড়ে গেল, খুব ছোটোবেলায় মাকে মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে গা-টা ধুয়ে এই হারমোনিয়ামটা নিয়ে বসে গান গাইতে দেখেছি। এমনই বরষা ছিল সেদিন, কিংবা চাঁদ কহে চামেলি গো।

লোকটা বাক্সটার ডালা খুলে আমাকে বলল, 'দেখে নাও। এর আর কিছু অবশিষ্ট নেই। বেলো-টা পুরোই ঘুণপোকায় খেয়ে দিয়েছে। রিডগুলোও অর্ধেক বেপাত্তা। দুশোটাকা দিয়ে গেলাম, ওটা নিয়ে বাজারে ঘুরে এসো। বাপ-ব্যাটায় কিছু মুখে দাও।'

তারপর হারমোনিয়ামের বাক্সটা অবলীলায় কাঁধে তুলে নিয়ে লোকটা উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়েও কী ভেবে একবার ঘুরে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মেসোমশাই, চললাম। আবার আসব।'

আমি বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বহুদিন বাদে ওই মুখে স্পষ্ট ক্রোধের ছায়া পড়েছে। তার মানে বাবা চাইছে না, লোকটা হারমোনিয়াম নিয়ে চলে যাক। কিন্তু কিছু করার নেই। ও তো নিয়ে যাবেই।

জিনিস কেনার যেমন নেশা থাকে, জিনিস বিক্রিরও যে ঠিক তেমনই নেশা থাকে সেটা আমি তার পরেই বুঝলাম। পরের দিন লোকটাকে আর খাটের তলায় উঁকি মারতে হল না। আমি নিজেই ওর হাতে তুলে দিলাম জ্যাঠামশাইয়ের ব্যবহার করা পুরোনো ক্যামেরা। উনি আর্মিতে ছিলেন। এরকম কিছু-কিছু জিনিস আর্মি-ডিসপোজাল থেকে জোগাড় করেছিলেন। সেগুলো একে-একে ওই ফেরিওলাকে বেচে দিলাম। ক্যামেরা, ঘড়ি, বাইনোকুলার।

প্রত্যেকবারই বাবার মুখে প্রথমে রাগ, তারপর কষ্ট ফুটে উঠত। কিন্তু তাতে কী? নড়তে তো পারে না। কথাও বলতে পারে না। শুধু তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে। ওদিকে আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়, ফেরিওলাটা জিনিসগুলোর আসল-দাম যা হওয়া উচিত, তার থেকে বেশি দাম দিয়ে ওগুলো আমার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছে। মোট কথা, ওর টাকাতেই আমার আর বাবার আজকাল খাওয়া জুটছে।

আজকাল আর ওর চিৎকারটা অতটা অসহ্য লাগে না। বাবার ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা হয়েছে উলটো। ওর ডাক শুনলেই বাবার লম্বা শরীরটা ছেঁড়া-কাঁথার নীচে গুটিয়ে ছোট্ট হয়ে যায়। বাবা থরথর করে কাঁপে।

তারপর কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

চৌকির নীচ থেকে একদিন একটা ছোটোদের বাই-সাইকেল বেরোল। এটা আমারই ছিল। ছ-সাত বছর বয়সে এই সাইকেলটা চালিয়ে গলির মধ্যে সারা বিকেল পাক খেতাম। কিন্তু আমি তো জানতাম, এটা আমাদের পুরোনো বাড়ি ছেড়ে আসার সময়েই সেখানে রেখে এসেছিলাম। এতদিন বাদে তাহলে চৌকির নীচ থেকে কেমন করে বেরোল!

নিজেদের জিনিস সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতা ভালো দেখায় না। তাই মুখে কিছু বললাম না। সাইকেলটাও বেচে দিলাম। তবে তারপর থেকে মাঝে-মাঝেই ওই চৌকির নীচ থেকে এমন সব জিনিস বেরোতে শুরু করল, যেগুলো, আমি নিশ্চিত ওখানে ছিল না। থাকা সম্ভব নয়।

যেমন মায়ের উষা সেলাইকল। সে তো কোন যুগেই মিস্তিরির বাড়ি থেকে চুরি হয়ে গিয়েছিল। ওটা যতদিন ছিল, ততদিন আমাদের অভাবের সংসারেও ছেঁড়া জামা-প্যান্ট পরতে হয়নি। মেশিনটা হারিয়ে যাবার পর থেকেই আমার প্যান্টের পেছনে ফুটো, বাবার পাঞ্জাবির পকেট ছেঁড়া এইসব দেখা যেতে লাগল।

সেলাই-মেশিনটা ফেরিওলার হাতে তুলে দেওয়ার সময় আমার নিজেরও একটু কষ্ট হয়েছিল। মুখে বোধহয় কষ্টটা ফুটে উঠে থাকবে, ফেরিওলা আমার মুখের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলল, 'উঁহু। কষ্ট পেয়ো না। অসুখে পড়বে'। ও মা! সত্যিই, সেদিন রাতে শোয়ার পরে আমার খুব নিশ্বাসের কষ্ট হল।

পরের দিন ও আমাদের বাড়িতে না ঢুকে সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমিই ডেকে দাঁড় করালাম। বললাম, 'ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলো তো। এই যে রুপোর পকেট-ঘড়ি, এটার কথা আমি জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই শুনে আসছি। বাবার মুখেই শুনেছি, তাঁর দাদুর এই পকেট-ঘড়ির গল্প। কিন্তু এটাও জানি যে বাবার দাদুর ইচ্ছা-অনুসারে ঘড়িটা তার চিতায় দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে আজ এই ঘড়ি কেমন করে বাবার ড্রয়ারে খুঁজে পেলাম?।'

ফেরিওলা ঘড়িটা নেড়েচেড়ে দেখল। তারপর নাকের কাছে ধরে বলল, 'এখনও চিতার গন্ধ লেগে আছে। আসলে কী হয় জানো। তোমার বাবা অসাড়ে শুয়ে-শুয়ে সারাদিন নানান জিনিসের কথা ভাবেন তো! সেইসব জিনিসগুলো অনেক সময় ফিরে আসে। সেলাই-মেশিনটার বেলাতেও তাই হয়েছিল। যাই হোক, একটা জিনিস কি তুমি বুঝতে পারছ, তোমার বাবা ক্রমশ ফিনিশ হয়ে আসছেন। আজ তোমাকে এই ঘড়িটার জন্যে দু-হাজার, আচ্ছা না, চারহাজার টাকা দিয়ে যাচ্ছি। এর থেকে সাতশোটা টাকা খরচা করে তুমি একবার ডক্টর নিয়োগীকে ডেকে এনে বাবাকে দেখাও। দেখো উনি কী বলেন। '

এই বলে ফেরিওলা তার হাতের কাপড়ের থলিটার মধ্যে থেকে একটা স্টিলের সাঁড়াশির মতন যন্ত্র বার করে, চড়চড় করে ঘড়িটার রুপোর মোড়ক ছাড়িয়ে নিল। বাবাও তাই দেখে একবার আঃ আওয়াজ করেই আবার নেতিয়ে পড়ল।

অদ্ভুত ব্যাপার, ডক্টর নিয়োগী এসে বাবাকে দেখে ঠিক ওই কথাই বললেন। বললেন, এই কদিনের মধ্যে বাবার সমস্ত অর্গ্যান নষ্ট হয়ে গেছে। ব্লাড-প্রেসার খুব বেশি। সুগারও তাই। অথচ ওইসব উপসর্গ বাবার কোনো দিনই ছিল না। ছিল শুধু মাথার শিরায় ব্লকেজ, যার থেকে ব্রেন-স্ট্রোক হয়েছিল। এই ডক্টর নিয়োগীই লক-ডাউনের আগে শেষবার যখন বাবাকে দেখেছিলেন, তখন বলে গিয়েছিলেন, উনি হেসে খেলে আরও দশ বছর বাঁচবেন।

কিন্তু এবার উনি বলে গেলেন, কিছুই ঠিক নেই। দু-দিনও থাকতে পারেন, দু-বছরও থাকতে পারেন।

আমি ন্যাচারালি আশা করেছিলাম, বাবা দু-দিনের মধ্যেই মারা পড়বে। কিন্তু দেখা গেল, দু-বছরের দিকেই ব্যাপারটা গড়াতে চলেছে।

ইতিমধ্যে পাড়ারই এক প্রোমোটার, আমরা যে-বাড়িটায় ভাড়া থাকি, সেটা কেনার ছক কষেছে। তার জন্যে আমাদের চার-ঘর ভাড়াটেকে ওঠানো দরকার। এমনি-এমনি তো আমরা উঠব না। ও আমাদের এক-একজনকে সাড়ে সাত-লাখ টাকা করে দেবে বলে কবুল করেছে। মুশকিল হচ্ছে, বাবা বলে দিয়েছে, মানে

ইশারায় বুঝিয়ে দিয়েছে, প্রাণ থাকতে এই বাড়ি ছেড়ে নড়বে না। কাজেই বাবার মৃত্যুটা এখন আরও বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে।

এদিকে নতুন করে আর বিক্রি করার মতন জিনিসও খুঁজে পাচ্ছি না। বাবা কি আর কিছুর কথাই ভাবছে না? ভাবলে তো সেগুলো চৌকির তলায় কিংবা ড্রয়ারের মধ্যে চলে আসত। কই, আসছে না তো!

ফেরিওলা মাঝেমধ্যে এমনিই আমার কাছে ঘুরে যায়। আমার সমস্যার কথা শোনে। বলে, 'আমি আর কী করতে পারি বলো। মেসোমশাইয়ের যত মায়ার জিনিস ছিল, সব তো ওনার চোখের সামনেই একটা-একটা করে লোপাট করে দিলাম। হারমোনিয়াম, ফোটো-ফ্রেম, অ্যালবাম, সেলাই-মেশিন, ঘড়ি। আর কোন মায়াটা বাকি রইল বলো।'

সত্যিই আর কিছুই প্রায় বাকি নেই। খিদের জ্বালায় শেষ অবধি একদিন আমার জেরক্স-মেশিনটাও জলের দরে ফেরিওলাকে বেচে দিলাম। এর পর আমাকে রাস্তায় গিয়ে ভিক্ষে করতে হবে।

কিন্তু সেই শেষদশা অবধি আর আমাকে যেতে হল না। তার আগেই হঠাৎ করে বাবা ফিনিশ হয়ে গেল।

সেদিন রাতে আমি জেরক্স-মেশিন বিক্রির পয়সায় ভালো করে বিরিয়ানি আর কোর্মা আনিয়ে খেয়েছিলাম। বাবাকেও চামচে করে একটু খাইয়েছিলাম। তারপর মেঝের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎই বাবার গলার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। বাবা পরিষ্কার গলায় আমার নাম ধরে ডাকছে — সোমু, সোমু!

প্রায় তিনবছর বাদে বাবার গলা দিয়ে এরকম স্পষ্ট স্বর বেরোচ্ছে। আমি এত অবাক হলাম যে, বলবার কথা নয়। মেঝের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে বাবার পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলাম। বাবা বলল, 'সোমু! যাকে তুই ফেরিওলা ভাবিস সে আসলে কী কিনতে আসে জানিস?।'

আমি বললাম, 'কী বাবা?।'

'মানুষের প্রাণ। ভাঙাচোরা জিনিসের ব্যাবসাটা আসলে ওর ভেক ছাড়া কিছু নয়। ওইসব জিনিসগুলোর সঙ্গেই ও আসলে একটু-একটু করে মানুষের প্রাণ নিয়ে চলে যায়।'

আমি বলাম, 'কী সব বকছ তুমি আবোল-তাবোল! তুমি তো ক্রমশ সেরেই উঠছ দেখছি। এই তো, আজ তিন-বছর বাদে আবার কথাও বললে। এবার ঘুমিয়ে পড়ো, কাল সকালে আবার বাকিটা শুনব'।

বাবা বলল, 'না রে সোমু। আমি আর কাল সকাল দেখব না। ওই দেখ। ও চৌকির নীচে ঢুকেছে। ওখানে ও কী করছে দ্যাখ। আঃ! আহ, আআহ!।'

বাবা প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতরে উঠল আর আমি চৌকির নীচে তাকিয়ে ভয়ে পাথর হয়ে গেলাম। দেখলাম, সত্যিই ওখানে অন্ধকারের মধ্যে আরও গাঢ় একতাল অন্ধকারের মতন হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই ফেরিওলা। ওর কুচি-কুচি চুলগুলো অন্ধকারের মধ্যেও চিকমিক করছিল। মনে হচ্ছিল, ঠিক যেন অতিকায় একটা কালো কুকুর গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে।

আমাকে উঁকি মারতে দেখে ও ফিশফিশ করে বলল, 'কী অবস্থা দেখেছ? এইজন্যেই মেসোমশাই মরতে পারছেন না। দ্যাখো, আমি আলো ফেলছি।'

এই বলে সেই কৃষ্ণাঙ্গ ফেরিওলা তার মুখটা হাঁ করল আর মুখের ভেতর থেকে এক ঝলক লাল আলো বেরিয়ে চৌকির নীচটা আলো করে তুলল। সেই আলোয় আমি দেখলাম, বাবার বিছানার তোষকের নীচ থেকে একগাদা শেকড় নেমে এসে মেঝের সিমেন্ট ফাটিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে।

বললাম, 'এই শেকড়গুলো।'

আমি কথা শেষ করার আগেই ও বলল, 'ঠিকই ধরেছ। বাড়ির ওপরে টান। যাকে বলে শেকড়ের টান। সবকটাই বেরিয়েছে মেসোমশাইয়ের শিরদাঁড়া থেকে। আমি কেটে দিচ্ছি।'

এই বলে ফেরিওলা তার যন্ত্রের থলি থেকে একটা বড়ো কাঁচি বার করে ক্যাঁচক্যাঁচ করে সবকটা শেকড় কেটে দিল। প্রথম দিকটায় বাবার মুখ দিয়ে প্রতিটি শেকড় কাটার সময় একটা শিসের মতন শব্দ বেরোচ্ছিল। আস্তে-আস্তে সেটা বন্ধ হয়ে গেল।

জানলা দিয়ে ভোরের আলো ঘরে ঢুকতেই ফেরিওলা তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চৌকির নীচ থেকে বেরিয়ে এল। শেকড়গুলোকে মুঠোয় ভরে থলির মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে আমাকে বলল, 'চলি। তুমি ডক্টর নিয়োগীকে ডাকতে পারো। উনি ডেথ-সার্টিফিকেট লিখে দেবেন।' এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শ্মশানে সারাক্ষণ সেই প্রোমোটার আর তার দুজন চ্যালা আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, ওদেরই যেন বাপ মরেছে। সে যাই হোক, চুল্লিতে ঢোকানোর আগে যখন বাবার গায়ে ঘি মাখাচ্ছিলাম, তখন ওদের মধ্যেই একজন বলে উঠল, ''ইশ। মেসোমশাইয়ের পুরো পিঠটা যে বেডসোরে ভরতি হয়ে গেছে। সোমুদা, তুমি আগে দ্যাখোনি?।'

আমি বললাম, 'চুপ করো। যা জান না, তাই নিয়ে কথা বোলো না। ওগুলো বেডসোর নয়, শেকড় ছেঁড়ার দাগ।'

ফেরিওলাটাকে তারপর থেকে কিন্তু আর কখনও দেখিনি।

* * *

ব্যাং কাটার ক্লাস

শুধু কেয়াদিদির কথা ভাববার জন্যেই ষোলোবছরের ছেলে পেখম আজকাল মাঝে-মাঝে কাজকর্ম ছেড়ে পুরোনো ওয়াটার-ওয়ার্কসের জমিতে গিয়ে বসে থাকে। মনটাকে ভেতরের দিকে গুটিয়ে এনে সে তিনবছর আগের একটা সন্ধের কথা ভাবে, যে সন্ধেয় কেয়াদিদির সারা মুখে হঠাৎই নুনের দানার মতন ঘাম ফুটে উঠেছিল, যদিও সেদিন তেমন গরম ছিল না। ফাল্গুন মাস ছিল তখন। বিকেলের পর থেকেই একটা সুবাতাস বইছিল।

এখন পেখম বুঝতে পারে, কেয়াদিদির ঘামের কারণ ছিল কাম।

লাল ফিতের নট আলগা হয়ে কেয়াদিদির কপাল আর গালের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছিল ঝুরো চুলের রাশি। পেখমের কাঁধদুটো জড়িয়ে ধরে উত্তেজনায় বড়ো-বড়ো নিশ্বাস ফেলছিল।

পেখমের ধ্যানে আজ আবার তিন-বছর আগের সেই সন্ধেটা জীবন্ত হয়ে ওঠে।

'আজ আজ' বলে লিখছি ঠিকই, কিন্তু এসব ঘটনা ঘটে গিয়েছিল উনিশশো আশি থেকে বিরাশির মধ্যে। এটা মনে রাখতে হবে, তা না হলে অনেক কিছুই আজকের সঙ্গে মেলানো যাবে না।

কাহিনির পটভূমিকা হুগলি জেলার ছোটো শহর, শ্রীধরপুর।



শ্রীধরপুরের পুব সীমানায় নদী ভাগীরথী। নদীর সমান্তরালে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড। এই নদী আর রাস্তার মাঝখানে কয়েকটা ইটভাটা ছাড়াও কয়েক-একর জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ব্রিটিশ আমলের ওয়াটার-ওয়ার্কস। পঞ্চাশ বছর আগে এখানে বড়ো-বড়ো ইটের চৌবাচ্চায় নদীর জল এনে জমানো হত। জলে মিশে থাকা পলি থিতিয়ে গেলে তার সঙ্গে ক্লোরিন মিশিয়ে সাপ্লাই দেওয়া হত শ্রীধরপুর আর আশেপাশের আরও কয়েকটা শহরে।

পুরো প্রোজেক্টটাই অনেকবছর আগে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এখন বাঁধানো চত্বর ফাটিয়ে এখানে-ওখানে শ্যাওড়া, ডুমুর, বট আর ভুরকুণ্ডের মতন জংলা গাছ মাথা তুলেছে; তবে পায়ের নীচে তেমন জঙ্গল হয়নি। ইটের ফাটলে শেকড় ঢুকিয়ে কিছু অদম্য ল্যানটানা আর আকন্দের ঝোপই শুধু বেড়ে উঠেছে।

লুডোর বোর্ডের মতন সারি দিয়ে সাজানো চৌবাচ্চাগুলোর মাঝখানে যে সরু পাড়, সেই পাড় ধরে হাঁটতে থাকে পেখম। একবার পা ফসকালে কুড়িফুট গভীর চৌবাচ্চার নীচে মরে পড়ে থাকবে — শকুন না উড়লে

কেউ খুঁজেও পাবে না। তবে পড়বে না। ষোলোবছরের কিশোরের জন্যে দু-ফুট চওড়া ইটের পাড় তো রাজপথ। ওরা প্যান্ডেলের বাঁশের ওপর দিয়ে ব্যালেন্স করে হেঁটে অভ্যস্ত।

নদীর ভাঙন ঠেকাবার জন্যে ভাগীরথীর পাড়-বরাবর ঢালু এমব্যাংকমেন্ট রয়েছে। সেই ঢাল বেয়ে পেখম একেবারে জলের কাছাকাছি নেমে গেল। তারপর একটা হেলে পড়া ডুমুর গাছের গুঁড়ির ওপরে উঠে বসল। আজকাল মাঝে মাঝেই কাউকে না জানিয়ে সে এখানে চলে আসে।

গম্ভীর ভেঁপু বাজিয়ে একটা গাধাবোট কাঁচা পাটের বান্ডিল নিয়ে আড়িয়াদহ জুটমিলের দিকে চলে যায়। সেই ভেঁপুর অনুনাদে চৈত্র-দুপুরের বাতাস ঢাকের ছাউনির মতন থিরথির করে কাঁপতে কাঁপতে আবার একসময় স্থির হয়। বোটের প্রপেলারের ধাক্কায় মাঝ-নদীতে যে ঢেউ উঠেছিল, সেগুলো অনেকখানি সময় নিয়ে, একে-একে পাড়ে এসে পৌঁছোয়; তারপর গার্ড-ওয়ালের গায়ে ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ করে আছড়ে পড়ে।

ওই বাতাসের থরথরানি বুকে তুলে নেয় পেখম। ওই ঢেউয়ের ছলাৎছল তার শিরায় ঢুকে পড়ে। শরঘাসের ডগায় একটা ঝিঁঝি এসে বসে। সেটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে পেখম ভাবে কেয়াদিদির পাণিশঙ্খের মতন ছোটো কিন্তু নিটোল স্তনদুটোর কথা। পুরোটা তো সে কখনোই দেখেনি। কেয়াদিদি যখন তার ওপরে ঝুঁকে পড়েছিল, তখন ওর স্কুল-ইউনিফর্মের ফাঁক দিয়ে যতটা দেখা যায় ততটুকুই দেখেছিল। মাঝের এই তিনবছরে অবশ্য কেয়াদিদির সেই পাণিশঙ্খ দু-হাতের তালুতে ধরে বাজাবার মতন বড়ো হয়ে উঠেছে।

একটা হাত নিজের ঊরুসন্ধিতে নামিয়ে আনে পেখম। হাফপ্যান্টের ওপর দিয়ে চেপে ধরে আপন শিশ্নের কাঠিন্য। ভারি ক্রোধের ভাব ফুটে ওঠে ওর মুখে। ও এখন আবার কেয়াকে চায়। সেদিনের তেরো বছরের বালকের আনাড়ি আগ্রহে নয়; আজকের ষোলোর কিশোরের মৈথুন-সামর্থ্যে।

শুরুতেই বলেছি, এসব প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশবছর আগের কথা। তখন শ্রীধরপুর ছিল একটা ছোটো শহর। শহরের মধ্যে পিচের রাস্তা ছিল কম, ইটবাঁধানো কিংবা কাঁচা রাস্তাই ছিল বেশি। রাস্তার ধারে, অনেক তফাতে তফাতে একটা করে ল্যাম্পপোস্ট ছিল, তাতে ডুম-লাইট জ্বলত। আলোর চেয়ে ছায়া হত বেশি। ছোটো-ছোটো একতলা দোতলা বাড়ি। টিনের কিংবা টালির চালের বাড়িও দেখা যেত। গঞ্জের বাসিন্দারা ছিলেন মূলত চাকুরিজীবী কিংবা ছোটো ব্যবসায়ী। এখন শহর জুড়ে ফ্ল্যাটবাড়ি আর হাউসিং-কমপ্লেক্স গজিয়ে উঠেছে।

শ্রীধরপুরে দুটো স্কুলও ছিল — একটা ছেলেদের আর একটা মেয়েদের। দুটো স্কুলেই উচ্চমাধ্যমিক অবধি পড়ানো হত। মেয়েদের স্কুলটার নাম সরোজিনী বালিকা বিদ্যালয়। আমাদের এই কাহিনিতে সরোজিনী বালিকা বিদ্যালয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। অতএব তার একটু বর্ণনা দেওয়া যাক।

বর্ণনা করার মতন বিশেষ কিছু নেই অবশ্য। দেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক পরে-পরেই কিছুটা সরকারি অনুদান আর কিছুটা পাবলিকের চাঁদা মিলিয়ে এখানকার কয়েকজন সমাজহিতৈষী মানুষ অতিকষ্টে মেয়েস্কুলটা তৈরি করেছিলেন। কাজেই তেমন বৈভব কিছু তার ছিল না।

একটা হলুদরঙের দোতলা পাকাবাড়ি আর তার সঙ্গে সমকোণে একটা লম্বা টালির চালের একতলা কোঠা — এই নিয়েই আশি সালের স্কুল। টালির চালের কোঠাবাড়িটাতেই স্কুলের পত্তন হয়েছিল। পরবর্তীকালে পাকা দোতলা বাড়িটা তৈরি হলে, কোঠাবাড়িটায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি আর বায়োলজির ল্যাবরেটরিগুলোকে স্থানান্তরিত করা হয়। লাইব্রেরিটাও ছিল ওই পুরোনো বাড়িতে।

অনেক কিছুরই অভাব আছে স্কুলটায় — উনিশশো পঞ্চাশেও ছিল, এই উনিশশো আশিতেও আছে। যথেষ্ট ক্লাসরুম নেই, পরিষ্কার শৌচাগার নেই, প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক-শিক্ষিকা যথেষ্ট নয়। শুধু অভাব নেই জমির। শ্রীধরপুরে জমি সস্তা ছিল বলেই যারা স্কুলের পত্তন করেছিলেন তাঁরা এক-লপ্তে দু-বিঘে জমি কিনেছিলেন।

এখন স্কুলবাড়িকে ঘিরে সেই জমিই পতিত হয়ে পড়ে আছে। দালানের ঠিক নীচে একটুকরো জায়গায় মেয়েরা সকালে প্রেয়ারের লাইনে দাঁড়ায়। প্রাইমারি সেকশনের বাচ্চারা খেলা করে হলুদবাড়ির পেছনের একটা ছোটো জমিতে। ওই দুটো জায়গাই যা একটু পরিষ্কার রয়েছে। বাকি মাঠটায় আশেপাশের বস্তির লোকজন গোরু-ছাগল ছেড়ে দিয়ে যায়। শীতের দিনে যার-যার লেপ-কাঁথাও মেলে দিয়ে যায় ওখানে।

বিল্ডিং-এর পেছনদিকের ছোটো জমিটায় একটা দোলনা আর একটা স্লিপ আছে। দোলনাটার কাঠের সিট ভাঙা। মেয়েরা টিফিনের সময় লোহার শেকলের ওপরে চটের আসন ভাঁজ করে রেখে দোল খায়। স্লিপটা আরও বিপজ্জনক। ঢালের একদম শেষে, মাটির কাছাকাছি একজাগায় একটু টিনের পাত উঁচু হয়ে আছে। ওপর থেকে স্লিপ খেয়ে নামবার সময় খুব সাবধান থাকতে হয়। ওই ভাঙা জায়গাটায় পৌঁছোনোর আগেই প্রাণপণে গোড়ালি দিয়ে চেপে পতনের বেগ না আটকালে রক্তপাত ঘটে।

পেখমের বাবা গৌরহরি ওই সরোজিনী স্কুলের বায়োলজির ল্যাবরেটরি-অ্যাসিস্ট্যান্ট। আরও দশরকম কাজ করতে হয় তাকে ঠিকই, তবে অফিসিয়ালি চাকরিটা তার ওই ল্যাবরেটরি-অ্যাসিস্ট্যান্টের।

গৌরহরি অসুস্থ মানুষ। নানারকমের অসুখ আছে তার। তার মধ্যে হাঁপানিই প্রধান। তা ছাড়া ডায়াবিটিসও থেকে থাকবে, যে-কারণে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেই চোখে পুরু কাচের চশমা। স্কুলের অফিসঘর থেকে বিভিন্ন ক্লাসরুমে নোটিশের খাতা নিয়ে যাওয়া, ছুটির পরে দরজায় তালা লাগানো কিংবা বায়োলজি ল্যাবরেটরির জিনিসপত্র মোছামুছি করার কাজটা ওই শরীর নিয়েই চালিয়ে দেয় গৌরহরি। কিন্তু আরও এমন কিছু কাজ আছে, যেগুলো সে ইদানীং আর পেরে ওঠে না। সেই কাজগুলো তার হয়ে করে দেয় তার ছেলে পেখম।

পেখমের কাজের কথায় পরে আসব। আগে বলে নিই তিন-বছর আগের সেই সন্ধেটার কথা, যেটা পেখমকে এখনও কামনায় তাতিয়ে তোলে।

সেদিন স্কুল ছুটির পরেও ক্লাস নাইনের কুমারী কেয়া মুস্তাফি গুম হয়ে নিজের জায়গায় বসে রইল। ক্লাসরুম থেকে বেরোনোর কোনো লক্ষণ দেখাল না। তার বান্ধবীরা তাকে অনেক ডাকাডাকি করল, অনেকরকম করে বোঝাল — আচ্ছা কেয়া! দু-একটা সাবজেক্টে একটু খারাপ নম্বর পেয়েছিস তো কী হয়েছে? অতসী তো পাশই করতে পারেনি। ও কি তোর মতন কাঁদছে? একটু ভালো করে পড়লে অ্যানুয়ালে ঠিক ভালো হবে, দেখিস। চল, এখন বাড়ি চল।

কেয়া হাই-বেঞ্চের ওপরে দুই হাত জড়ো করে তার মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকে। নড়াচড়া করে না। সাড়াও দেয় না। বান্ধবীরা শুধু তার ঘন চুলের মধ্যে চেরা সিঁথি আর স্থলপদ্মের পাপড়ির মতন ঘিয়ে-রঙের পাতলা কানের পাতাদুটো দেখতে পায়। রাগে, না লজ্জা, না ভয়ে কে জানে, যে পাপড়িতে তখন লালের আভা — ঠিক স্থলপদ্মের মতোই। তাই দেখে এমনকি অন্য মেয়েগুলোও একটু মুগ্ধ হয়ে যায়। ভাবে, কেয়ার কি সবই সুন্দর?

মিনতি কেয়াকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে বলে, চল, আমরা তোর সঙ্গে যাচ্ছি। কাকিমাকে বুঝিয়ে বলব যাতে তোকে বকাঝকা না করে।

এতক্ষণে কেয়া মুখ তুলে ঝাঁজিয়ে উঠে বলে, অত দয়া না দেখালেও হবে। তোরা চলে যা। আমি যখন ইচ্ছে হবে যাব।

এবার ওর বন্ধুরাও রেগে যায়। শিপ্রা, শিখা, চন্দনারা মিনতির হাতে টান দিয়ে বলে, চল চল! বাচ্চা মেয়ে তো নয় যে, একা-একা রাস্তা হারিয়ে ফেলবে।

কেয়ার বন্ধুরা ওকে ক্লাস-নাইন, সেক্সন সি-র ঘরে একা রেখে চলে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে হাতের ঘেরের মধ্যে থেকে মুখ তুলে কেয়া দেখল, পুরো স্কুল-বিল্ডিংটাই কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে। জানলার বাইরে বেলা পড়ে আসছে। খুব নীচু দিয়ে একের পর এক গাংশালিখের ঝাঁক ঘুঙুরের মতন শব্দ করে উড়ে যাচ্ছে বাসার দিকে। কমলা রং লেগেছে রোদ্দুরের গায়ে। কেয়ার ভয় হল, ওকে দেখতে না পেয়ে গৌরহরিদা ঘরের বাইরে থেকে তালা দিয়ে চলে যাবে না তো?

কেয়া বেঞ্চির ওপরে রাখা স্কুলব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ব্যাগের নীচে প্রোগ্রেস-রিপোর্টটা চাপা দিয়ে রেখেছিল। সেটা বেরিয়ে এল। কেয়া ভুরু কুঁচকে রিপোর্টটার দিকে তাকাল। অনেকগুলো নম্বরের নীচে লাল-কালির দাগ। ইংরেজি, অঙ্ক, ইতিহাস। ভেঙচি কাটার মতন একটা ভঙ্গি করে কেয়া প্রোগ্রেস-রিপোর্টটা ভাঁজ করে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে, সামনের মেন-গেটের দিকে না গিয়ে সোজা চলে এল স্কুলবাড়ির পেছনে — যেখানে প্রাইমারি-সেকশনের মেয়েগুলো দোলনায় দোল খায়, স্লিপ বেয়ে নামে।

একটুকরো ঘাসজমির ওপরে দোলনা আর স্লিপ। পেছনে স্কুলবাড়ি। সামনে পনেরো-ফুট উঁচু পাঁচিল। অনেকদিন বাদে এদিকটায় এল কেয়া। এসে ভালো লাগল তার। এ এমন একটা জায়গা যেখানে বসে ইচ্ছে করলে কাঁদা যায়, নিজের মনে পাগলের মতন হাসা যায় আর আরও কিছু কাজ করা যায়, যার কথা ভাবতে গিয়ে কেয়ার তলপেট টান-টান হয়ে ওঠে।

কিছুদিন হল নিজের শরীরটাকে নিয়ে খুব বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে কেয়া। হঠাৎই তার টেপজামাগুলো এত টাইট হয়ে উঠছে, হঠাৎই ঊরুদুটো এত ভারী। সেদিন বাথরুম থেকে চান করে বেরোতেই জ্যাঠাইমা চাপা গলায় কী বকুনিটাই না বকল — পিঠের বোতাম লাগিয়ে বেরোতে পারো না? দালানে এতগুলো পুরুষমানুষ ঘোরাফেরা করছে, তোমার লজ্জা নেই? ধিঙ্গি হচ্ছ, বুদ্ধি বাড়ছে না কেন?

চোখে জল এসে গিয়েছিল কেয়ার। সে তো কোনোকালেই পিঠের দিকে হাত ঘুরিয়ে বোতাম আটকাতে পারে না। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলে মা বোতাম লাগিয়ে দেয়। জ্যাঠাইমা কি ভুলে গেল সে-কথা?

ছাদে যাওয়ার সিঁড়ির ধাপে বসে কেয়া ভাবে, আচ্ছা, ধিঙ্গি হওয়া মানে কী? এই যে টেপজামা টাইট হয়ে যাওয়া, ঘামের গন্ধ পালটে যাওয়া আর শরীরের এখানে-ওখানে এক-একটা অসভ্য জায়গাকে ছুঁলেই এযাবৎ অচেনা এক বিদ্যুৎ — একেই কি ধিঙ্গি হওয়া বলে? সেটা কি খুব খারাপ? কিন্তু কেয়া তার জন্যে কী করতে পারে? সে তো ইচ্ছে করে বড়ো হচ্ছে না।

আর বড়ো হওয়ার সবটাই কি খারাপ? কেয়া তো কত লোকের চোখেই আজকাল মুগ্ধতা দেখতে পায়। যখন শাড়ি পরে রাস্তা দিয়ে হাঁটে তখনও দেখতে পায়। এমনকি গুরুজনেরাও তো আজকাল তার চিবুকে আঙুল ছুঁইয়ে দু-দণ্ড তাকিয়ে থেকে বলেন, কী সুন্দর দেখতে হচ্ছে আমাদের কেয়া-মাকে!

এইভাবে ক্রমশ সুন্দর হয়ে ওঠাটাও কি তার দোষ?

এইসব ভাবনা নিয়েই ইদানীং বিপর্যস্ত হয়ে আছে কেয়া। তার মন ভালো নেই। অদ্ভুত এক অস্থিরতা সারাক্ষণ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। বাইরে থেকে কেউ সেকথা বুঝতে পারে না; তার স্কুলের বান্ধবীরাও না। সেইজন্যেই তার পড়াশোনায় মন বসে না। সেইজন্যেই সে আজ খারাপ রেজাল্ট করেছে।

খারাপ রেজাল্ট হাতে নিয়ে কেয়ার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। ভাবছিল, কেমন হয়, যদি কোনোদিনই আর না ফিরি?

কেয়া একবার দোলনার শেকলটায় হাত বোলাল। তার মনে পড়ে গেল চার-পাঁচ বছর আগেও সে কত দোল খেয়েছে এই দোলনাটায়। কত নির্ভার, নিশ্চিন্ত, সুখের দিন ছিল তখন। অন্যমনস্কভাবেই কেয়া কাপড়ের স্কুলব্যাগটা শেকলের ওপর ভাঁজ করে রেখে আস্তে-আস্তে দোল খেতে শুরু করল। বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। মনটা ক্রমশ হালকা হয়ে উঠছিল ওর।

কিছুক্ষণ দোল খাওয়ার পরে কেয়ার ইচ্ছে হল এবার একটু স্লিপ খায়। দিদিমণিরা দেখতে পেলে নিশ্চয়ই খুব বকতেন। বলতেন, লজ্জা করে না, বাচ্চাদের খেলার জিনিসগুলোয় চাপছিস! কিন্তু এখন তো দিদিমণিরা কেউ নেই। কোনো জনপ্রাণীই নেই চারিধারে। শুধু কমলারঙের আকাশে নীল হিরের মতন সন্ধ্যাতারাটাই তাকে দেখতে পাচ্ছে। এই তো সুযোগ। কেয়া লোহার মই বেয়ে স্লিপের মাথায় উঠে গেল। আর তখনই ও ছেলেটাকে দেখতে পেল।

ওকে চেনে কেয়া। গৌরহরিদার ছেলে, পেখম। ল্যাবরেটরি-বাড়ির দালানের একদম শেষ ঘরটায় ওরা থাকে। হাফপ্যান্ট আর একটা হাফহাতা শার্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। হাঁ করে কেয়াকেই দেখছে

কেয়াও পেখমকে দেখছিল। ভালো লাগছিল দেখতে। কী সুন্দর টুলটুলে মুখ ছেলেটার। শান্ত দুটো চোখ, টিকোলো নাক। গায়ের রংটা ঠিক কাঁসার বাসনের কলঙ্কের মতন চকচকে কালো, যার মধ্যে থেকে একটা সবুজ আভা ফুটে বেরোচ্ছে।

কেয়া জানে, ওর থেকে একটু ছোটোই হবে পেখম। তবু এর মধ্যেই পায়ে অনেক লোম গজিয়ে গেছে। পেশিও গজিয়েছে।

পেখমও কেয়াকে দেখছিল। কেয়াকে নয়, কেয়ার নারীত্বকে। স্লিপের মাথায় বসে ছিল কেয়াদি। স্লিপ খেয়ে নামবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে হাঁটু থেকে পা দুটো বুকের দিকে গুটিয়ে এনেছিল আর তাই সেই-মুহূর্তে কেয়াদির স্কুল-ইউনিফর্মের সাদা স্কার্টটা অনেকটা ওপরে উঠে গেছে। পেখম দেখছিল, অস্তসূর্যের আলো এসে পড়েছে কেয়াদির মাখনের মতন নরম মসৃণ দুই ঊরুতে। ঊরুদুটো যেখানে গিয়ে মিশেছে, সেখানে ত্বকের সাদার সঙ্গে তুমুল কনট্রাস্ট তৈরি করেছে কেয়াদির ইজেরের একফালি টুকটুকে লাল স্ফীতি। পেখম বুঝতে পারছিল, এক্ষুনি তার চোখ সরিয়ে নেওয়া উচিত, কিন্তু পারছিল না। কিছুতেই পারছিল না। পাখমারার আঠাকাঠিতে যেভাবে টিয়াপাখি আটকে যায়, সেভাবেই ওই এক-বিঘৎ লাল রঙে তার চোখদুটো আটকে গিয়েছিল।

পেখমের দৃষ্টিপথ বুঝতে পেরেই কেয়ার ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি খেলে গেল। পেছনে স্কুলবাড়ি। সামনে পাঁচিল। সন্ধ্যাতারা ছাড়া কেউ তাদের দেখছে না। কেয়া পা-দুটো আর একটু বিস্তৃত করল। তারপরেই হঠাৎ লজ্জা জড়িয়ে ধরল তাকে। সেই লজ্জা থেকে বাঁচবার জন্যেই কেয়া পা-দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে মসৃণ টিনের চাদর বেয়ে স্লিপ খেয়ে বিদ্যুতগতিতে নেমে এল নীচে আর পরক্ষণেই মুখ বিকৃত করে কাতরোক্তি করলো, মা গো!

পেখমের সম্মোহন কেটে গেল। সে দৌড়ে এল কেয়ার দিকে। কেয়া তখন স্লিপের পায়ের কাছে ঘাসজমির ওপরে আধশোয়া হয়ে বসে আছে। বাম ঊরুটা জড়িয়ে ধরেছে দুহাতের মধ্যে। চোখে জল টলটল করছে আর দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছে নীচের ঠোঁট।

পেখম কেয়ার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে বলল, কী হল কেয়াদি?

কেয়াকে উত্তর দিতে হল না। পেখম নিজেই দেখতে পেল কী হয়েছে। স্লিপের নীচের দিকে উঠে-থাকা সেই টিনের খোঁচাটা কেয়ার বাঁদিকের ঊরুর নীচের চামড়ায় প্রায় এক বিঘৎ লম্বা একটা আঁচড় টেনে দিয়েছে।

দাঁড়াও, আমি আসছি। এই বলে পেখম দৌড়ে গেল পাঁচিলের দিকে। পাঁচিলের পায়ের কাছে ওর মায়ের বসানো টিরে-গাঁদার জঙ্গল। সেখান থেকে একমুঠো গাঁদাপাতা ছিঁড়ে এনে, দু-হাতে ডলে, পেখম কেয়ার দিকে বাড়িয়ে ধরল। বলল, এই নাও। গাঁদাপাতার রস লাগিয়ে নাও। এক্ষুনি জ্বলুনি কমে যাবে।

আমি কি দেখতে পাচ্ছি নাকি কোথায় কেটেছে? তুই লাগিয়ে দে। বলল কেয়া। আঁচড়টার ওপরে গাঁদাপাতার রস লাগাতে গিয়ে পেখম বুঝতে পারল সে পারবে না। তার হাত থরথর করে কাঁপছে। ঠিক তখনই কেয়া তার হাতটা নিজের হাতের মুঠিতে চেপে ধরে টেনে আনল নিজের ঊরুসন্ধির দিকে। পরক্ষণেই পেখম হাতের মধ্যে পেয়েছিল রোমশ এক কাঠবেড়ালির কোমল স্পর্শ।

এসব তিন-বছর আগের কথা। এখন ওই স্কুলেই বিজ্ঞান শাখায় দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ছে কেয়া মুস্তাফি। এই তিন-বছরে কিশোরী থেকে নারী হয়ে উঠেছে কেয়া। স্বাভাবিকভাবেই এখন তার উচাটন-ভাব পুরোপুরি না হলেও অনেকটাই শান্ত।

বয়ঃসন্ধির অবিবেচনায় সে যে একদিন পেখমের সঙ্গে যৌন খেলায় মেতেছিল, এ-কথা ভাবলে এখন তার লজ্জা আর ঘেন্নায় মরে যেতে ইচ্ছে করে। এমনিতে কেয়া ভীষণই মিশুকে মেয়ে। কিন্তু ওই ঘটনার জন্যেই

তারপর থেকে পেখমের ,শুধু পেখমের সঙ্গেই সে কোনো কথা বলে না। পারলে পেখমকে নিজের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিত না সে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয়?

তার কারণ, বায়োলজির প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো পেখমকে ছাড়া হবে না। গৌরদার শরীর এই তিনবছরে একেবারেই ভেঙে পড়েছে। সারাদিন নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে সে হাঁপায়। পেখম ওর বাবার হয়ে পুরো কাজটাই করে ব'লে গৌরদার চাকরিটা রয়েছে। এই দুর্দিনের বাজারে কে আর একজন লোকের চাকরি খেতে চায়? অন্তত সরোজিনী স্কুলের কমিটি-মেম্বাররা চাননি।

আর এটাও স্বীকার করতেই হবে যে, ওর বাবার সঙ্গে হাতে হাতে কাজ করতে-করতে পেখম ল্যাবরেটরি-অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজটা ভারি ভালো শিখে নিয়েছে। কেয়াদের বায়োলজির টিচার গীতাদি পেখমকে ছাড়া চোখে অন্ধকার দেখেন। এক-এক ক্লাসে চল্লিশ পঞ্চাশজন করে মেয়ে। গীতাদি নিজে আর কতজনকে হাতে ধরে শেখাবেন?

গীতাদির সঙ্গে সঙ্গে তাই পেখমও ঘুরে-ঘুরে ওদের শেখায় কীভাবে নতুন ব্লেড দিয়ে কাগজের চেয়েও পাতলা করে কেটে নিতে হয় পানের বোঁটার ক্রস-সেকশন। কীভাবে মাইক্রোস্কোপের ফোকাস ঠিক করতে হয়, যাতে আই-পিসে চোখ রাখলেই সেই ক্রস-সেকশনের মধ্যে রুপোর বুদবুদের মতন ভেসে ওঠে গাছের কোশকলা, জাইলেম আর ফ্লোয়েম।

এমন ছেলের সঙ্গে কি আর সবসময় দূরত্ব বজায় রাখা যায়? এই তো, আগের বছরেই, মানে কেয়া যখন ক্লাস ইলেভেনে পড়ে, একদিন গীতাদি এসে ছাত্রীদের বললেন, কাচের স্লাইডে যে যার আঙুল থেকে এক ফোঁটা করে রক্ত নিয়ে অণুবীক্ষণের নীচে রেখে দ্যাখো।

আরও অনেক মেয়ের মতন কেয়াও নিজের তর্জনীর ডগায় নিজে কীভাবে ছুঁচ বেঁধাবে ভেবে কূল পাচ্ছিল না। তখন পেখম এগিয়ে এসে নিজের আঙুলের রক্ত দিয়ে ওকে একটা স্লাইড বানিয়ে দিয়েছিল। শুধু ওর জন্যেই পেখম ওই কাজটা করেছিল। মন পাওয়ার চেষ্টা? কেয়া কোনো কথা না বলে মনে-মনে বলেছিল, কাঁচকলা! তোর সে-আশায় চিটেগুড় রে পেখম!

কেয়া মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেখমকে দেখতেও কি ভীষণ কুৎসিত হয়ে যাচ্ছে। তিনবছর আগে পেখমের চোখে-মুখে বালক-কৃষ্ণের মতন যে-লাবণ্য দেখে কেয়া নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল, সেই লাবণ্যের কিছুই আজ অবশিষ্ট নেই। অথচ পৌরুষও আসেনি ওর। এই বয়সে ছেলেরা লম্বায় বেড়ে ওঠে। পেখম বাড়েনি। উপরন্তু বিচ্ছিরি মোটা হয়ে গেছে। চামড়া খসখসে, সারা মুখে অজস্র ব্রণ, চুল পাতলা। এমনকি ভুরুর লোমও ঝরে গেছে অনেক। ভুরু আর চোখের পাতা কম থাকার জন্যেই বোধহয়, এখন ওর বড়ো-বড়ো চোখদুটোকে আরও বীভৎস লাগে।

গীতাদি একদিন গৌরহরিদাকে বলছিলেন, ছেলেটাকে ডাক্তার দ্যাখাও গৌর। ওর মনে হয় কোনো হরমোনাল ডিজিজ হয়েছে।

কিছু যে একটা হয়েছে, সেটা পেখম নিজেও বুঝতে পারে। তবে সেটা শরীরের অসুখ নয়, অন্য কিছু।

আজ পেখমের পৃথিবীতে কোনো স্বপ্ন নেই, গান নেই, হাসি,গল্প কিছুই নেই। মানুষ-মানুষীও যেন নেই। চারিদিকে তাকালে তার মনে হয়, শুধু চামড়া দিয়ে মোড়া পেশি, স্নায়ু, হাড়, হার্ট, ফুসফুস, বৃক্ক, লসিকা আর রক্তের কোটি-কোটি বান্ডিল ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুরো পৃথিবীটাই যেন একটা বায়োলজির ল্যাবরেটরি। দিনকে-দিন এই অনুভূতিটা আরও প্রবল হচ্ছে।

আজকাল একটু রাত হলেই পেখম দু-একটা বইখাতা নিয়ে নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের বায়োলজি ল্যাবরেটরির ঘরে ঢুকে পড়ে। প্রথম-প্রথম মা জিজ্ঞেস করত, ওখানে যাচ্ছিস কেন? পেখম একদিন ঝাঁজিয়ে উঠে জবাব দিয়েছিল, কেন যাচ্ছি বুঝতে পারছ না? একে তো তোমার স্টোভের ধোঁয়ায়

চোখ জ্বলছে। তার মধ্যে বাবা সারাক্ষণ কেশে চলেছে। এর মধ্যে বসে পড়াশোনা করা যায়? কথাগুলো মিথ্যে নয়। তাই তারপর থেকে ওর মা আর কিছু বলে না।

ল্যাবরেটরির চাবি ওদের ঘরেই থাকে। দেয়ালের হুক থেকে সেই চাবি নিয়ে, দরজা খুলে, পেখম ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়ে। ভেতর থেকে দরজাটায় আলতো করে ছিটকিনি তুলে দেয়। তারপর সে ঘরটার এক কোনায় একটা টেবিলের সামনে পেতে রাখা কাঠের চেয়ারে বসে বই বা খাতা একটা কিছু খোলে — কিন্তু ওই অবধিই। পড়তে সে পারে না, কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরটা জীবন্ত হয়ে ওঠে।

নোনা-ধরা ইটের দেয়ালের ওপরের দিকটায় দর্মার সিলিং। তার ওপরে টালির চাল। সিলিং-এর ওপরে খড়খড় মড়মড় শব্দ ওঠে। হয়তো ইঁদুর ধরার জন্যে সাপ ঢুকেছে। ঘুমন্ত পায়রাগুলো কীসের ভয়ে কে জানে, হঠাৎই জেগে উঠে কুব কু-করে ডাক ছাড়ে ; তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

একটা লম্বা তারের সঙ্গে ঝোলানো বালব, সিলিং-এর ফাঁক দিয়ে ঢুকে-আসা চোরা হাওয়ার স্রোতে মাঝে মাঝে দুলে ওঠে। সেই সঙ্গেই দুলে ওঠে দেয়ালের গায়ে হাজারটা ছায়া। সারি-সারি আলমারির ছায়া, দেয়ালে ঝোলানো চার্টের ছায়া, টেবিলে সার দিয়ে রাখা মাইক্রোস্কোপের ছায়া।

মাইক্রোস্কোপের ছায়াগুলোর দিকে তাকালে ওদের মাইক্রোস্কোপ বলে চেনা যায় না মনে হয় ছোটো ছোটো বামন মানুষ, পেখমের মতোই বেঁটে আর মোটা, কোলকুঁজো হয়ে বসে আছে। পেখমের মনে হয়, সে ওই বামনগুলোর সঙ্গেই নরক থেকে এখানে উঠে এসেছে। এই শ্রীধরপুরের কেউ নয় সে। এই পৃথিবীরই কেউ নয়। সে নরকের জীব। তাই যদি না হবে, তাহলে কেয়াদিদি কেন তাকে এত হতছেদ্দা করবে? কেন তার চোখে চোখ পড়লেই ঘেন্নায় কুঁচকে যাবে ওর মুখ?

স্বপ্ন গান হাসি গল্প দিয়ে গড়া স্বাভাবিক পৃথিবীটাকে তখন পেখমের আরও অসহ্য মনে হয়। সেই পৃথিবী থেকে পালানোর জন্যেই পেখম চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। একটার পর একটা চার্টের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

পুরোনো আমলের প্রমাণ-সাইজের এক-একটা রঙিন ডায়াগ্রাম। কোনোটায় মানুষের পৌষ্টিক তন্ত্র, বিষের মতন নীল পাকস্থলী, চকোলেট-কালারের যকৃৎ। কোনোটায় শ্বসন-তন্ত্র, দুটো স্ট্রবেরি আইসক্রিমের স্কুপের মতন ফুসফুস। কোনোটায় জনন-তন্ত্র — স্ত্রী এবং পুরুষের আলাদা আলাদা দুটো ডায়াগ্রাম। দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে এই ডায়াগ্রামগুলোর মতনই মনে হয় পেখমের।

স্ত্রী-জননতন্ত্রের ডায়াগ্রামটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় পেখম। ডায়াগ্রাম যেমন হয়, এটাও সেরকম। চামড়া ছাড়িয়ে, পেটের পেশির থাক দুদিকে সরিয়ে ভেতরের কলকবজা সব দেখানো হয়েছে। প্রায় প্রমাণ সাইজের ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে পেখম ফিশফিশ করে ডাকে, কেয়াদি! আলতো করে আঙুল বোলায় ডিসেক্ট করা স্তনের ওপরে, আঙুরের মতন গুচ্ছ-গুচ্ছ মেদের স্তর, টিস্যু আর দুগ্ধগ্রন্থির ওপরে।

চুলহীন চোখহীন সেই ছবির নারীর এতে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

ভারি খুশি হয় পেখম। কেয়াদি যদি বাস্তবেই এরকম সহ্যশীলা হত, তাহলে কতই না ভালো হত, ভাবে সে। তারপর আঙুল নামিয়ে আনে ছবির ঊরুর ওপরে। সেখান থেকে যোনিপথে, জরায়ুর অন্দরে, ফ্যালোপিয়ান টিউবে। পেখমের তর্জনী সারা ডায়াগ্রাম জুড়ে ওঠানামা করে আর সারাক্ষণই সে ফিশফিশ করে ডাকে — কেয়াদি, কেয়াদি, কেয়াদি!

তার ইচ্ছে করে কেয়াদিকে সেই তিনবছর আগের মতন আর একবার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা ছবিকে তো আর আলিঙ্গন করা যায় না। তাই সে পায়ে-পায়ে এগিয়ে যায় ল্যাবরেটরি-রুমের অন্য আর এক কোনায় একটা উঁচু স্ট্যান্ড থেকে টাঙিয়ে রাখা কঙ্কালটার দিকে।

পেখমের মাঝে মাঝেই মনে হয়, এই স্কুলের মেয়েগুলো ভোঁতামার্কা। শুধু পাশ করবার জন্যে পড়ে। ওরা কেউ কোনোদিন গীতাদিকে জিজ্ঞেস করে না, এটা মেয়েমানুষের কঙ্কাল না পুরুষমানুষের! কিন্তু পেখম জানে, এটা মেয়েমানুষের। বায়োলজি সে গুলে খেয়েছে।

কঙ্কালটার সামনে দাঁড়িয়ে পেখম খুব আদর করে তার পেলভিক-গার্ডলে হাত বোলায়। পুরুষমানুষের কঙ্কাল হলে এই কোমরের নীচের হাড়ের বেড়িটা সরু হত। মেয়েদের পেলভিক-গার্ডল অনেক বেশি চওড়া হয়, কারণ ওইখান দিয়েই তাদের সন্তান প্রসব হয়।

পেখম আস্তে-আস্তে কঙ্কালটাকে জড়িয়ে ধরে। বলে, আমি জানি কেয়াদি, তুমি আমাকে ভালোবাসো। না হলে সেদিন আমাকে অমন করে...।

সেদিনের কথা ভাবতে-ভাবতে পেখম কঙ্কালটাকে একহাতে জড়িয়ে ধরে অন্য হাতে স্বমেহন করে — ওই ল্যাবরেটরির মধ্যেই।

গীতাদি একদিন গৌরহরিকে ডেকে বললেন, গৌর, টুয়েলভের মেয়েরা কি এবছর ব্যাং কাটবে না? কী হল? চুপ করে আছ যে? কিছু বলো।

গৌরহরি মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, শরীরে দেয় না দিদি।

তা বললে হবে গৌর? হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার সময় মেয়েগুলো তো এক্সটার্নালদের সামনে অপদস্থ হবে। কিছু একটা ব্যবস্থা করো।

পেখম একপাশে দাঁড়িয়ে ওর বাবা আর দিদিমণির কথোপকথন শুনছিল। সে আস্তে-আস্তে বলল, আমি এনে দেব।

তুই পারবি? একটু অবিশ্বাসের সুরে বললেন গীতাদি।

পারব। পেখমের গলায় আত্মবিশ্বাস ছাড়াও আরও কী যেন একটা ছিল। গীতাদি ঠিক বুঝতে পারলেন না, তবে রাজি হয়ে গেলেন। শুধু বললেন, সাবধানে কাজ করিস বাবা। পুকুরে, ডোবায় ঘুরতে গিয়ে বিপদ বাঁধাস না যেন।

কাজটা, মানে ব্যাং ধরার কাজটা, পেখমের এমন কিছু কঠিন লাগল না। আগের বছর অবধি ওর বাবাই ল্যাবরেটরিতে ডিসেকশনের জন্যে ব্যাং ধরে আনত। তার জন্যে বাবার একটা স্পেশাল ছিপ ছিল। বিরাট লম্বা তলতা বাঁশের হাতল। তার সঙ্গে সাধারণ ছোটো মাছ ধরার বঁড়শির মতোই একটা বঁড়শি। সেদিনই দুপুরে ছিপটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পেখম।

ছিপ বাবার, তবে বাবা যেসব খালে-বিলে ঘুরে ব্যাং ধরত সেসব জায়গায় ও গেল না। ও সোজা চলে গেল পরিত্যক্ত ওয়াটার-ওয়ার্কসের মাঠে। পেখম আগেই দেখেছে, পুকুরের মতন বড়ো ইটের চৌবাচ্চাগুলোর মধ্যে এই বর্ষাকালে নানান ধরনের অজস্র ব্যাং জন্ম নিয়েছে। ওর দরকার কোলাব্যাং — বুফো মেলানোস্টিকটাস।

বঁড়শিতে কেঁচো গেঁথে ফেলতে না ফেলতে কোলাব্যাংগুলো টপাটপ বঁড়শি গিলতে শুরু করে দিল। বিকেলের আগেই একটা চটের থলিতে খান চল্লিশ ব্যাং নিয়ে পেখম ফিরে এল। ব্যাং রাখার জন্যে বড়ো-বড়ো কয়েকটা মুখ আঁটা কাচের জার ল্যাবরেটরিতে রাখাই ছিল। সেগুলোর মধ্যে ব্যাংগুলোকে ঢুকিয়ে দিয়ে পেখম টিউবওয়েলে হাত-পা ধুয়ে এল।

পরদিন গীতাদি টুয়েলভের মেয়েদের বলে দিলেন বায়োলজি-বক্স নিয়ে আসতে, ব্যাং কাটা শেখাবেন।

বছরের শুরুতে নতুন বইখাতার সঙ্গে সব মেয়েই একটা করে বায়োলজি-বক্স কিনে রেখেছিল। এতদিন সেগুলো তেমন কাজে লাগেনি। এবার লাগল।

পেখম একদম এক্সপার্টের মতন কাচের জারের মধ্যে ক্লোরোফর্মের সলিউশন ঢেলে ব্যাংগুলোকে অজ্ঞান করে ফেলল। তারপর ওয়ার্ক-টেবিলে আলাদা-আলাদা ট্রে-তে করে প্রতিটি মেয়ের সামনে সাজিয়ে দিল।

প্রথম দিনে জ্যান্ত ব্যাং হাতে করে পাকড়াতে গিয়ে অনেক মেয়েরই বমি করে ফেলার উপক্রম। দ্বিতীয় দিনে কোনোরকমে ট্রে-র মেঝেতে বিছিয়ে-রাখা মোমের মোটা পরতের মধ্যে ব্যাঙের পাগুলোকে পিন দিয়ে গাঁথতে পারল ওরা। পেখম আর গীতাদি মিলে দেখিয়ে দিলেন, কীভাবে বুকের চামড়া-পেশি কেটে,

পাঁজরের হাড় চিমটে দিয়ে সরিয়ে, ব্যাঙের দেহগহ্বর উন্মুক্ত করতে হয়। তৃতীয় দিনে কিন্তু অনেক মেয়েই নিজেরা কাঁচি দিয়ে কেটে, জলে ধুয়ে, এক-একটা করে সিস্টেমকে দিব্যি আলাদা করে ফেলতে পারল।

কেয়াও বেশ ইন্টারেস্ট পেয়ে গেল ব্যাপারটায়। তবে পেখমকে সে কোনোভাবেই ডিসেকশনের সময় কাছাকাছি আসতে দিত না। দেয়ালে হেলান দিয়ে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে কেয়ার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত পেখম।

এসব ছিল আষাঢ় মাসের কথা। এর পর শ্রাবণ মাস এল। তারিখটা ছিল বাইশে জুলাই— ভয়ংকর বাদুলে একটা দিন। আগের রাত থেকেই দফায় দফায় ঝেঁপে বৃষ্টি হয়ে চলেছিল। দুপুরের পরে বৃষ্টিটা ধরেছে দেখে কেয়া সুতপা দিদিমণির বাড়ি অঙ্কর ট্যুইশনে গিয়েছিল। কিন্তু বিকেল চারটে নাগাদ কেয়া যখন বাড়ি ফিরছে, তখন আবার আকাশ কালো করে, মেঘ ডেকে বৃষ্টি নামল।

কেয়ার ব্যাগে ছাতা ছিল। ছাতা খুলে সে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। চড়কডাঙার মোড় থেকে বড়োরাস্তা ছেড়ে সে শর্টকাট ধরল। হাসি মল্লিকদের বাগানের মধ্যে দিয়ে মোরামের রাস্তা। বাগানটা পেরিয়ে গেলেই কেয়াদের বাড়ি।

বাগান বলা হয় ঠিকই, কিন্তু আসলে বন। দুদিকে বাঁশঝাড়, আর যতরকমের বুনো গাছের জটলা। মোরামের ওপরে পায়ের পাতা ডোবা জল দাঁড়িয়ে গেছে। তার মধ্যে দিয়েই ছপ-ছপ করে জল ছিটোতে ছিটোতে কেয়া হেঁটে যাচ্ছিল। খুব মজা লাগছিল তার। সে যেন ছোটোবেলায় ফিরে গিয়েছিল। হঠাৎ বিকৃত গলায় কে যেন একটা বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে ডেকে উঠল — কেয়া! কেয়া! কেয়া!

কেয়া থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক মুহূর্তের জন্যে সে ভীষণই ভয় পেয়ে গিয়েছিল তবে পরমুহূর্তেই তার ঠোঁটে হালকা হাসি ফুটে উঠল। সে মফসসল শহরে জন্ম থেকে বড়ো হওয়া মেয়ে। অনেক আগানে-বাগানে এমন বর্ষার দিনে সে ঘুরেছে। এ আওয়াজ তার চেনা।

কেয়া মোরামের রাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপরে পা ফেলে সাবধানে কিছুটা এগিয়ে গেল। একটা চন্দনকচুর ঝাড়কে পাক দিয়ে, উলটোদিকে উঁকি মেরে দেখল, হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছে। ওই যে, একটা নালার মধ্যে আধখানা শরীর ডুবিয়ে শুয়ে রয়েছে দাঁড়াশ সাপটা। মুখের মধ্যে একটা প্রমাণ সাইজের কোলাব্যাং।

ব্যাংটার পেছনের পা-দুটো সাপের মুখের মধ্যে ঢুকে গেছে। বাকি শরীরটাও আস্তে-আস্তে ঢুকে যাবে, আর যতক্ষণ ধরে ঢুকবে ততক্ষণই ব্যাংটা ওইভাবে ডেকে যাবে — কেয়া! কেয়া! কেয়া! বিস্ফারিত চোখে ঠিক কেয়ার মুখের দিকেই তাকিয়েছিল ব্যাংটা। দু-চোখে সারা পৃথিবীর অবিশ্বাস। যেন ভাবতেই পারছে না, এইভাবে তাকে কেউ জ্যান্ত গিলে ফেলতে পারে।

এটা ব্যাঙেদের মেটিং-সিজন। প্রজনন-ঋতু। শ্রীধরপুরের সমস্ত ডোবা, পুকুর, খালবিল আর কাঁচা নালা বৃষ্টির জলে টইটুম্বুর হয়ে রয়েছে আর সেই জলে গা ভাসিয়ে পুরুষ কোলাব্যাংগুলো অনর্গল গ্যাঙর-গ্যাঙ করে মেয়ে ব্যাঙেদের ডেকে চলেছে। ওই প্রজননের ঝোঁকেই অন্যমনস্ক হয়ে যায় বেচারারা আর সেই সুযোগে সাপেরা ওদের টপাটপ ধরে ফেলে। তখন ওদের ডাক বদলে যায়। গ্যাঙরগ্যাঙের বদলে তখন ওদের মুখ দিয়ে ওই বেড়ালছানার মতন কেয়া কেয়া ডাক বেরোয়।

কেয়া পা টিপে-টিপে পিছিয়ে আবার মোরাম রাস্তায় উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু মাঝপথেই তার সঙ্গে কার যেন ধাক্কা লাগল। কে যেন চুপি-চুপি তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

কেয়ার হাত থেকে ছাতাটা মাটিতে পড়ে গেল। সে অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠল — উঃ, মা গো! তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে মানুষটাকে দেখেই তার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। মানুষ কোথায়, এ তো একটা পুরুষ কোলাব্যাং। বেঁটে, মোটা। ভুরু নেই, চুল নেই। সারা মুখে ব্যাঙের মতোই গোটা গোটা ব্রণ। গোল-গোল চোখদুটো দিয়ে যেন কেয়াকে গিলে খাবে মনে হচ্ছে। কেয়া অসাড়-দশাটা কাটিয়ে ওঠার আগেই পেখম এক-হাতে ওকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে ওর খোলা কাঁধে মুখ নামিয়ে আনল। অন্য হাতটা ঢুকিয়ে দিল কেয়ার স্কার্টের তলায়।

প্রবল আতঙ্ক আর বিবমিষায় কেয়া নড়াচড়া করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। পেখমের থাবা ক্রমশ চেপে বসছিল কেয়ার ঊরুসন্ধির নানান ভাঁজে। ওর মুখ থেকে ফেনার সঙ্গে বেরিয়ে আসছিল একটা অদ্ভুত আওয়াজ — কক, কক, কক। শব্দটা কেয়া অনেকবার শুনেছে। মাদি ব্যাঙের ঘাড়ে যখন মদ্দা ব্যাঙ চাপে, তখন তারা এরকম শব্দ করে।

কেয়া ভাবল, ব্যাঙের কামড়েও কি বিষ থাকে? আমার হাত-পাগুলো এরকম অবশ হয়ে যাচ্ছে কেন? কেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না?

তুলোর পুতুলের মতন ভিজে ঘাসজমির ওপরে বসে পড়ল কেয়া। পেখম পেছনদিক থেকে ওর সামনে চলে এল। ওর দুটো কাঁধ চেপে ধরে ওকে সেই ভিজে ঘাসের ওপরে শুইয়ে দিয়ে ঝুঁকে পড়ল ওর ওপরে। তারপর ভারি অদ্ভুত একটা কাজ করল। কেয়ার ডান কানের লতি থেকে ছোটো সোনার দুলটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে এনে পেখম সেটাকে পরম তৃপ্তির সঙ্গে গিলে খেয়ে নিল।

কানের লতিতে আগুনে পোড়ার অনুভূতি। কেয়া আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করল, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, ওর গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোল না। পেখম এবার কেয়াকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কেয়া দেখল, পেখম ওর দু-পায়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গায়ের কালো টি-শার্টটা মাথা গলিয়ে খুলে ফেলছে। আকাশ আড়াল করে আছে পেখমের মাখা ময়দার তালের মতন ফ্যাকাশে থলথলে ভুঁড়ি আর বুক। ওর বুকের ঠিক মাঝখানে একটা লাল জড়ুল — সেটাও পরিষ্কার দেখতে পেল কেয়া।

অত আতঙ্কের মধ্যেও কেয়া অবাক হয়ে ভাবল, এরকমই কি হয়! প্রতিটি মেয়েই কি রেপড হবার আগে এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রেপিস্টের শরীর দেখতে পায়? ভাবতে-ভাবতেই পেখম নিজের ঢোলা হাফপ্যান্টটা নীচে নামিয়ে দিল। কেয়া অবাক হয়ে দেখল ওর ভুরু কিংবা চোখের পাতার মতন বস্তিপ্রদেশও সম্পূর্ণ নির্লোম। শিশুর মতন মসৃণ তলপেটের নীচ থেকে ঝুলছে যম-কালো এক যৌনদণ্ড।

ওই জঘন্য দৃশ্যই নিশ্চয়ই কেয়ার শরীরে সাড় ফিরিয়ে আনল। সে হাত বাড়িয়ে ছাতাটা কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

হাসি মল্লিকের বাগানে এতক্ষণ ধরে যা ঘটে চলেছিল, তার মধ্যে কোথাও উচ্চগ্রামের কোনো আওয়াজ ছিল না। এখনও কেয়া চ্যাঁচাল না। শুধু ঘৃণায় আর ক্রোধে বিকৃত হয়ে গেল আঠেরো-বছরের যুবতীর সুন্দর মুখ। সে খুব ঠান্ডা মাথায় ছাতার ডগার ছুঁচলো রডটা পেখমের ডানচোখে একবার ঢুকিয়ে আবার টেনে বার করে আনল।

পেখমও চিৎকার করল না। শুধু একটা হাত দিয়ে নষ্ট চোখটা ঢেকে ফেলল। অন্য চোখে তখনও সে অবাক হয়ে কেয়ার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। কেয়া দেখল ওর সেই আস্ত চোখটায় অবিকল দাঁড়াশ-সাপের মুখে ধরা ব্যাংটার মতন অবাক দৃষ্টি।

মৃত্যুর ছায়া পড়েছিল সেই চোখের মণিতে।

কেয়া পেখমের মুখ থেকে নজর না সরিয়েই নিজের বাঁ কানের লতি থেকে অবশিষ্ট সোনার টপটা প্যাঁচ ঘুরিয়ে খুলে স্কার্টের পকেটে পুরল। তারপর মাটিতে একদলা থুতু ফেলে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। যাবার পথেই সে একটু দুব্বোঘাস চিবিয়ে ডান কানের লতিতে আর দুই উরুর ক্ষতে লাগিয়ে নিয়েছিল। জ্বলুনি কমে গিয়েছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

আধঘণ্টা বাদে পেখম মারা গিয়েছিল।

ঠিক কীসের টানে যে পেখম কোনো হাসপাতালে না গিয়ে, স্কুলবাড়িতে তাদের ছোটো ঘরটার দিকে না গিয়ে, এমনকি শ্রীধরপুরের লোকালয়ের দিকেও না গিয়ে ওয়াটার-ওয়ার্কসের মাঠে চলে গিয়েছিল, তা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। একটা চোখ সকেট থেকে উপড়ে বাইরে চলে এলে যে যন্ত্রণা হয়, তা নিশ্চয়ই মাথা খারাপ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। হয়তো সেইজন্যেই ওর এই কাজের মধ্যে কোনো যুক্তি ছিল না।

অসহ্য যন্ত্রণা নিয়েই পেখম দুটো চৌবাচ্চার মাঝখানের দু-ফুট চওড়া পেছল রাস্তা ধরে ভাগীরথীর তীরে সেই হেলে-পড়া ডুমুরগাছটার দিকে যেতে গিয়েছিল এবং সেদিনই জীবনে প্রথমবার তার পা পিছলে গিয়েছিল। কুড়িফুট ওপর থেকে ইট-বাঁধানো মেঝের ওপরে আছড়ে পড়েছিল সে। ইটের চৌবাচ্চার তলায় সামান্য বৃষ্টির জল জমে ছিল ঠিকই, কিন্তু স্থুলাকার পেখমের আছড়ে পড়ার ইমপ্যাক্ট সামলানোর পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না।

সেইযে কোলাব্যাংগুলো, পেখম যাদের ডিসেকশনের জন্যে ধরে নিয়ে যেত, তারা প্রথমে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলেও কিছুক্ষণ বাদে পেখমের মৃতদেহের ওপরে পূর্ণ উদ্যমে চড়াও হয়েছিল।

বাইশে জুলাই ভোরবেলায় যে-বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, সাতদিন কেটে যাওয়ার পরেও সেই বৃষ্টি ধরল না। ভাগীরথীর জল পাড় ভাসিয়ে শ্রীধরপুর শহরে ঢুকে এল। শহরের সমস্ত রাস্তায় এক হাঁটু করে জল। চতুর্থদিনেই হাওড়া লোকোশেডে জল জমে যাওয়ার ফলে লোকাল ট্রেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওই হাওড়া মেন-লাইনই ছিল শ্রীধরপুরের লাইফ-লাইন; ফলে শ্রীধরপুর তখন একটা দ্বীপের নাম, যেখানে লোকজন গৃহবন্দি। বাজার বসে না, বিদ্যুতও থাকে না অধিকাংশ সময়েই।

তার মধ্যেও অবশ্য সরোজিনী বালিকা বিদ্যালয় খোলা ছিল। কাছেপিঠে যাদের বাড়ি, তেমন কিছু মেয়ে জল ভেঙে স্কুলেও আসছিল। কেয়াও ছিল তাদের মধ্যে।

উনত্রিশে জুলাই গীতাদি টুয়েলভ-বি, মানে কেয়াদের ক্লাসে এসে বললেন, টিফিনের পরের পিরিয়ডটায় তোমরা ল্যাবরেটরিতে যাবে। অল্প কিছু ব্যাং রয়ে গেছে। ওগুলোর সদগতি করে দেব আজ।

গীতাদির কথা মতন টিফিনের পরে কেয়া তার আরও কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে মাঠে জমে-থাকা জল ভেঙে ল্যাবরেটরিতে পৌঁছোল। ল্যাবরেটরি-বাড়ির দাওয়ার সিঁড়ি জলে ডুবে গেছে। ওরা ল্যাবরেটরিতে ঢুকে দেখল, পেখম নেই। গীতাদি আছেন আর আছে গৌরদা। গৌরদা পাথরের মূর্তির মতন একটা লম্বা টুলের ওপরে বসে ছিল আর মাঝে-মাঝে হাতের উলটোপিঠ দিয়ে চোখ মুছছিল। গীতাদি চাপা-গলায় ছাত্রীদের বললেন, ওকে আজ জ্বালিয়ো না। ওর মনটা খারাপ। পেখম আজ সাতদিন হল বাড়িছাড়া জানো তো? তোমরা নিজেরা জার থেকে স্পেসিমেনগুলো বার করে নিয়ে বোর্ডের ওপরে মাউন্ট করো। অসুবিধে হলে আমাকে ডাকবে।

কেয়াকে এক প্রবল আলস্য পেয়ে বসেছিল। কিছুই করতে ইচ্ছে করছিল না। তার বান্ধবীরা যে যার স্পেসিমেন বার করে নেওয়ার পরে সে কাচের জারটার কাছে গিয়ে দেখল একটাই মাত্র আধমরা মাদি ব্যাং ক্লোরোফর্মের প্রভাবে ধুঁকছে। গীতাদি বলেছেন, আজ ব্যাঙের জনন-তন্ত্রটুকুকে রেখে বাকি সব অর্গান ফেলে দিতে হবে। মাদি ব্যাং নিয়ে সেই কাজ করা এই বর্ষার সিজনে খুব ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। পেট কাটলেই দেখা যাবে থোকা-থোকা ডিমে ভরতি হয়ে আছে ভেতরটা। সেই ডিম কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করতেই অনেক সময় লেগে যাবে। অথচ... কেয়া ল্যাবরেটরির মেঝের দিকে তাকাল। ওই যে একটা বিশাল মদ্দা ব্যাং একটু দূরে বসে ড্যাব-ড্যাব করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ব্যাটা নিশ্চয়ই বর্ষার জলের সঙ্গে এখানে ঢুকে পড়েছে।

কেয়া চট করে ব্যাংটাকে হাতে তুলে নিয়ে নিজের ডিসেকশন-ট্রের সামনে ফিরে এল। আজ পেখম নেই, তাই ক্লোরোফর্ম করার প্রশ্নও নেই। 'পিথ' করতে হবে।

'পিথিং'-এর টেকনিক গীতাদিই তাদের হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন; এফেক্টটা ক্লোরোফর্ম করার থেকে খারাপ কিছু হয় না। কেয়া বাঁ-হাতে ব্যাংটাকে চেপে ধরে বায়োলজি-বক্স খুলে নিডল বার করল। তারপর ব্যাংটার ঘাড়ের নীচে নরম জায়গাটা খুঁজে নিয়ে সেখান দিয়ে নিডলটাকে গভীরে ঢুকিয়ে দিল। খুব দ্রুত কয়েকবার নিডলটাকে নাড়াচাড়া করতেই ব্যাংটার স্পাইনাল-কর্ড ছিঁড়ে গেল। ব্যাংটা বেঁচে রইল তবে নড়াচড়ার করবার ক্ষমতা রইল না।

এবার কেয়া ব্যাংটাকে চিৎ করে, ডিসেকশন-ট্রের মোমের আস্তরণের ওপর টান টান করে শুইয়ে, চার হাত-পা পিন দিয়ে গেঁথে দিল। ওটার কয়েকটা শারীরিক বৈশিষ্ট্য খেয়াল করল কেয়া।

এক, ব্যাংটার ডান চোখের জায়গায় একটা খালি গর্ত।

দুই, মাখা ময়দার তালের মতন ফ্যাকাশে থলথলে পেটের ঠিক মাঝখানে ছড়িয়ে পড়া একটা লাল জড়ুল।

তিন, দীর্ঘ কালো এক লিঙ্গ, যা কোনো উভচরেরই থাকার কথা নয়।

কেয়া চিমটে দিয়ে ব্যাংটার বুকের চামড়ার কিছুটা টেনে তুলে, কাঁচি দিয়ে সেই চামড়াটুকু কেটে ট্রে-র মধ্যে ফেলে দিল। তারপর চামড়ার সেই ছিদ্রের মধ্যে কাঁচির সরু ফলাটা ঢুকিয়ে বুকের ঠিক মাঝখান বরাবর পেশি কেটে দুদিকে সরিয়ে দিল। উন্মুক্ত হয়ে গেল ব্যাংটার শরীরের ভেতরের সমস্ত কলকবজা। হার্টটা তখনও প্রবল আক্ষেপে সংকুচিত- প্রসারিত হচ্ছিল।

সে তো করবেই। ও-ব্যাপারে কেয়ার কোনো আগ্রহ ছিল না। সে কাঁচির সরু ডগা দিয়ে টেনে বার করল ব্যাংটার পাকস্থলী। ধারালো স্ক্যালপেলের একটানে চিরে ফেলল নীলচে পেশির দেয়াল। খাদ্যবস্তুর কোনো অবশিষ্টাংশ যে সেখানে দেখতে পাবে না, তা ততক্ষণে বুঝে নিয়েছিল কেয়া। তবে যেটা দেখতে পাবে বলে ভেবেছিল, সেটা ছিল। ওর ডান কানের সোনার দুলটা।

দুলটাকে চিমটে দিয়ে তুলে কলের তলায় ভালো করে ধুয়ে নিলো কেয়া। তারপর যত্ন করে কানে পরল। স্কার্টের পকেট থেকে বাঁ কানের দুলটাও বার করে পরে নিল। একটা আলমারির কাচের সামনে দাঁড়িয়ে দেখে নিল, দুলদুটো ঠিকঠাক পরা হয়েছে কিনা; তারপর আবার ফিরে এল ডিসেকশন-ট্রের সামনে।

ব্যাংটার হার্টের ধুকপুকুনি ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেয়া সেটাকে মোমের বিছানা থেকে হাতে করেই টেনে তুলে নিয়ে, ল্যাবরেটরির জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে দিল। পেছনের নিমগাছে একটা কাক যেন ওঁত পেতেই বসে ছিল। মরা ব্যাংটাকে হাওয়া থেকে লুফে নিয়ে কাকটা উড়ে গেল পুরোনো ওয়াটার-ওয়ার্কসের দিকে।

* * *

ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন

বাড়িটা প্রায় চল্লিশ-বছরের পুরোনো। টুম্পার শ্বশুরমশাই তৈরি করেছিলেন। নীচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটুকরো বাগান। সেই বাগান থেকে দু-ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠলে গ্রিলে ঘেরা সরু একটা রোয়াক আর রোয়াকের গায়ে পাশাপাশি দুটো শোবার ঘর, একচিলতে রান্নাঘর আর একদম শেষে একটা কলঘর। ব্যস, বাড়ি ওখানেই শেষ। রোয়াকের বাইরে, উঠোনের একদিক দিয়ে ছাদে ওঠার জন্যে একটা ন্যাড়া সিঁড়ি আছে অবশ্য।

তড়িৎবাবু যখনই এ-বাড়িতে আসেন, চলে যাওয়ার আগে একবার কলঘরে ঘুরে আসেন। আজকেও গিয়েছিলেন। ভিজে-হাত নিয়ে বেরিয়ে এলেন। গ্রিলের গায়ে টুম্পার তোয়ালে শুকোচ্ছিল। একবার সেটার দিকে হাত বাড়িয়েও, কী যেন ভেবে, নিজের গ্রে-ট্রাউজারের পকেট থেকে সাদা রুমাল বার করেই হাত মুছে নিলেন।

টুম্পা ওর শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তড়িৎবাবুর হাবভাব লক্ষ করছিল। ও যেটা আশঙ্কা করছিল সেটাই সত্যি হল। তড়িৎবাবুর কপালে ভাঁজ। তার মানে উনি ব্যাপারটা খেয়াল করেছেন। রুমালে হাত মুছতে-মুছতেই উনি টুম্পাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওয়াশরুমের জানলার কাচটা ওভাবে ভাঙল কেমন করে?



আটমাস আগে যখন এই বাড়িতে প্রথম এসেছিলেন তখন থেকেই উনি 'ওয়াশরুম' শব্দটা ব্যবহার করেন। কলঘর তো নয়ই, বাথরুমও নয় ওয়াশরুম। টুম্পার কানে লাগে। ওই স্যাঁতসেঁতে ঘরটার সঙ্গে কলঘর নামটাই বেশি মানায়। অন্তত টুম্পার তো তাই মনে হয়। লাল সিমেন্টের মেঝেয় বড়ো বড়ো ফাটল, তার মধ্যে সারাক্ষণ অজস্র আরশোলার শুঁড় নড়তে চড়তে দেখা যায়। দেয়ালের চুনকামের ওপরে ড্যাম্পের নীল ছোপ। বিয়ে হয়ে এ-বাড়িতে আসার পর থেকেই টুম্পা ওই ছোপগুলোর মধ্যে নানারকমের বীভৎস সব মুখের ছবি খুঁজে পায়। কলঘরের দেয়ালের গায়ে চৌবাচ্চা। অনেকদিন পরিষ্কার করা হয় না। একটু জোরে মগ ডোবালেই জলের নীচ থেকে মরচের মতন কী সব উঠে আসে।

তড়িৎবাবু আবার বললেন, কাচটা কবে ভাঙল? হু হু করে হাওয়া ঢুকছে। তোমার এখন ঠান্ডা লেগে গেলে মুশকিল। আজকেই সারিয়ে নাও। কিছু টাকা দিয়ে যাব? উনি হিপপকেট থেকে মোটাসোটা পার্সটা বার করলেন।

টুম্পা তাড়াতাড়ি বলল, আর টাকা দিতে হবে না। এই তো আমার অ্যাকাউন্টে এতগুলো টাকা ট্রান্সফার করলেন। ওর মধ্যে থেকেই সারিয়ে নেব। আমি মিস্ত্রিকে খবর দিয়েছি।

হরলিকস কিনে দিয়ে গেলাম। খেয়ো। আর অ্যামন্ডস।

টুম্পা ঘাড় নাড়ল।

তড়িৎবাবু একটা টুলের ওপরে বসে পায়ে মোজা গলাতে-গলাতে গম্ভীরগলায় বললেন, তোমার জন্যে যা কিনে দিয়ে যাই তার থেকে কানুকে খাইও না। কানুর যা খেতে ইছে করে — ক্যাডবেরি, চিপস — আমাকে বলবে। আমি কিনে দিয়ে যাব।

টুম্পা বুঝতে পারে এই কথাটা উনি কেন বললেন। আজ উনি বাড়িতে ঢুকেই দেখেছেন, কানু একটা বাটিতে কাজু আর কিশমিশ নিয়ে খাচ্ছে। ওগুলো আসলে টুম্পার জন্যেই উনি গতসপ্তাহে কিনে দিয়ে গিয়েছিলেন। টুম্পার একা খেতে মন সরে না। কানুকে দেয়। আজ যে তড়িৎবাবু বারণ করে গেলেন, ও জানে, তারপরেও দেবে। কানুকে না দিয়ে খেতে ও পারবে না।

তড়িৎবাবুর জুতো পরা হয়ে গিয়েছিল। মোবাইলে ড্রাইভারকে বললেন গাড়িটাকে গলির মুখে এনে দাঁড় করাতে। এই সরু গলির মধ্যে ওঁর বিশাল গাড়িটা ঢোকে না।

উঠোনে নামার আগে হঠাৎই তড়িৎবাবু টুম্পার দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে বললেন, একবার ছোঁব?

টুম্পা চট করে দরজার মুখ থেকে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। আলো-আঁধারি ঘরটার মধ্যে দাঁড়িয়ে ম্লান হেসে বলল, ছোঁন। আপনারই তো। জুতো পরে ফেলেছিলেন বলে তড়িৎবাবু আর ঘরের মধ্যে ঢুকলেন না। দরজায় দাঁড়িয়েই লম্বা হাতটা বাড়িয়ে আঙুলের ডগা দিয়ে টুম্পার ফুলে ওঠা তলপেটটা ছুঁলেন। হাউসকোটের ওপর দিয়েই ছুঁলেন। মুখে অল্প হাসি ফুটে উঠল। তারপর আর পেছনে না তাকিয়ে বাগানের গেট খুলে বেরিয়ে গেলেন।

# # # # #

কলঘরের জানলার কাচটা ভেঙেছিল কাল রাতে। অনেক রাতে তখন বোধহয় একটা কী দেড়টা বাজে। তবে তার আগে রাত দশটা নাগাদ আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। গলির উল্টোদিকে রাজা মিত্তিরদের বাড়ির পেছনদিকে একটা মাদি-কুকুর পাঁচটা বাচ্চা দিয়েছিল। তার মধ্যে দুটো মরেছে। বাকি তিনটে গলির মধ্যে খেলা করে, খাবার খোঁজে। ওরা কানুর খুব ন্যাওটা। কানু স্কুলে যাওয়ার আগে ওদের একমুঠো ভাত দিয়ে যায়। রাতেও খাওয়া শেষ হলে এঁটোকাঁটা যা থাকে ওদের দিয়ে আসে। গায়ে হাত বুলিয়ে আদরও করে মাঝে মাঝে। এইটুকুর জন্যেই বাচ্চা তিনটে কানুকে চোখে হারায়। ওকে দেখলে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে কী যে করবে ভেবে পায় না।

কাল রাতেও কানু একটা ছোটো বাটিতে ভাত, চিকেনের হাড় এইসব নিয়ে ওদের খাওয়াতে গিয়েছিল। ফিরে এল মুখ শুকনো করে। টুম্পা জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে? কানু বলল, একটা বাচ্চা মরে গেছে মা।

সেকীরে? কোথায়? কেমন করে মরল? গাড়ি চাপা দিয়ে গেছে?

কানু ঘাড় নেড়ে বলল, উঁহু। আমাদের বাগানের মধ্যেই তো। দেখে এসো।

কানু আর সঙ্গে গেল না। বেচারা মনে বেশ ঘা খেয়েছিল। টুম্পা একাই অন্ধকারের মধ্যে টর্চ নিয়ে গেল এবং গিয়ে যা দেখল তাতে ওর গা গুলিয়ে উঠল। দেখল, বাগানের ইটবাঁধানো রাস্তাটার ওপরে, যেখানে কানু প্রতিদিন ওদের ভাত দেয় তার খুব কাছেই বাচ্চাটা পড়ে আছে। আস্ত একটা থান ইটের নিচে মাথাটা চাপা পড়ে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে, ওই ইটের বাড়ি মেরেই কেউ ছোট্ট জীবটার মাথা থেঁতলে দিয়েছে। টুম্পার মনে হল তখনও যেন বেচারার পেছনের পা দুটো একটু-একটু নড়ছে। ও দৌড়ে ঘরে ঢুকে এসেছিল।

ওদের বাগানে ঢুকে কে এরকম নিষ্ঠুরভাবে কুকুরছানাটাকে মারল? কিছু বদমাশ ছেলে আছে অবশ্য পাড়ায় — নানাভাবে কুকুরগুলোকে উত্ত্যক্ত করে। আর একজন আছেন, ইলেকট্রিসিটি অফিসের তপনবাবু, রাস্তার কুকুরের ওপর খুব রাগ। মিউনিসিপ্যালিটিতে বলে-কয়ে আগের বছর কয়েকটা কুকুরকে পিঁজরাপোলে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু উনি এরকম কাজ করবেন বলে হয় না।

কুকুরছানাটার থ্যাঁতলানো মুখের কথা ভেবেই টুম্পার ঘুম আসছিল না। অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে শেষমেশ ভাবল একবার কলঘরে ঘুরে এসে, জল খেয়ে, নতুন করে ঘুমনোর চেষ্টা করবে।

কলঘরের আব্রু রাখার জন্যেই একপাল্লার জানলা-দুটো বসানো হয়েছিল বাগানের দিকের দেয়ালে, প্রায় ছাদের কাছ বরাবর। পাল্লাগুলো চিরকাল বন্ধই থাকে; টুম্পা কখনও ওদের খোলা অবস্থায় দ্যাখেনি। কাঠের পাল্লার বদলে ঘসা কাচ বসানো থাকায় ওগুলোর মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো কলঘরের ভেতরে এসে পড়ে, দিনের বেলায় অন্তত আলো জ্বালতে হয় না। কাল রাতে টুম্পা কলঘর থেকে বেরোনোর সময় একটা বড়োসড়ো পাথর জানলার কাচ ভেঙে কলঘরের মেঝেয় এসে পড়ল। বিকট ঝনঝন আওয়াজ করে চারিদিকে ছিটকে পড়ল ধারালো কাচের স্পলিনটার।

পাথরটা টুম্পার মাথায় এসে পড়তে পারত। যে-কোনো একটা কাচের টুকরো ওর গালে কিংবা গলায় ঢুকে যেতে পারত। সেসব কিছুই হল না। সাত-মাসের গর্ভ নিয়েও টুম্পা খুব তাড়াতাড়ি উবু হয়ে, দু-হাতে মাথা ঢেকে বসে পড়তে পেরেছিল, তাই কিছু কাচের টুকরো ওর পিঠের ওপর দিয়ে গড়িয়ে মেঝেয় পড়ল। শোয়ার ঘর থেকে বেরোনোর আগে গায়ে মোটা একটা শাল জড়িয়ে এসেছিল বলে পিঠটা কাটেনি।

চিৎকার করে উঠতে গিয়েও থেমে গিয়েছিল টুম্পা। বুকের কাঁপুনিটা কমার পরে যত্ন করে মেঝে থেকে সমস্ত কাচ ওই রাতেই পরিষ্কার করে ফেলেছিল। ওর চিন্তা ছিল তড়িৎবাবুকে নিয়ে। একই কারণে সকালে যে সুইপার-ছেলেটা বাড়ি-বাড়ি ময়লা নিতে আসে তার হাতে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে মরা কুকুরছানাটাকেও বেলা বাড়ার আগেই সরিয়ে দিয়েছিল। ও চাইছিল তড়িৎবাবু যেন কোনো অস্বাভাবিকতা না বোঝেন। উনি অবধারিতভাবে চাইবেন টুম্পার জীবনে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু টুম্পা নিজে তো তা চায় না।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে প্রথমেই কানুর শোবার ঘরে উঁকি মেরেছিল টুম্পা। না, ছেলেটা জাগেনি। সারাদিন গুন্ডামি করে বেড়ানোর পরে রাতে যেমন অঘোরে ঘুমোয় সেইভাবেই ঘুমোচ্ছিল। তারপর গিয়ে দাঁড়িয়েছিল রান্নাঘরে। রান্নাঘরের পেছনের দেয়ালের গায়ে একটা দরজা আছে, আছে একটা জানলাও। দরজাটা দিয়ে বাগানে বেরোনো যায়। রাতে শোয়ার আগে টুম্পার একটা কাজ হচ্ছে সদরের মতন এই খিড়কি-দরজাটাকেও ভেতর থেকে খিল দিয়ে বন্ধ করা। দরজাটা বন্ধই ছিল। টুম্পা জানলার পাল্লাটা অল্প ফাঁক করে অন্ধকারের মধ্যেই দেখবার চেষ্টা করেছিল, যে পাথরটা ছুড়েছিল তাকে দেখা যায় কিনা। না, সে কাউকে দেখতে পায়নি।

# # # # #

তড়িৎবাবু চলে যাওয়ার পরে টুম্পা ধীরেসুস্থে স্নান সেরে নিয়েছিল। এখন যা করার ধীরেসুস্থেই করতে হয়। সাতমাসের প্রেগনেন্সি স্বাভাবিকভাবেই তাকে শ্লথ করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে পাড়ার দোকান থেকে মিস্ত্রি এসে কলঘরের জানলার কাচ বদলে দিয়ে গেছে। টুম্পা চান করতে ঢুকে কিছুক্ষণ দেয়ালের গায়ে বসানো সিমেন্টের তাকটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ফাটল-ধরা তাকটার ওপরে একটা পুরোনো খবরের কাগজ ভাঁজ করে পেতে রাখা আছে। ওই তাকটার ওপরে চিরকাল একটা সর্ষের তেলের আর একটা নারকেল তেলের শিশি থাকত। আর থাকত প্লাস্টিকের সোপ-কেসে সস্তার একটা সাবান আর গা ঘষার জন্যে ধুঁদুলের ছাল। এখন সেখানে অন্তত দশ রকমের শ্যাম্পু, সাবান আর লোশন। তড়িৎবাবু টুম্পাকে সবরকমে ভরিয়ে দিয়েছেন।

টুম্পাকে নয়, আসলে টুম্পার মধ্যে দিয়ে উনি টুম্পার পেটের বাচ্চাটাকে ভরিয়ে তুলছেন। এ-কথা টুম্পা বোঝে।

স্নানের শেষে টুম্পা তাক-ভরতি টয়লেট্রির মধ্যে থেকে বেছে বেছে একটা লোশনের কৌটো তুলে নিয়ে নাভির চারিপাশে কিছুক্ষণ আলতো হাতে মালিশ করল। এটা নাকি বাচ্চা হওয়ার পরে পেটে ওই বিচ্ছিরি দাগগুলো হতে দেয় না। কানু হওয়ার পরে টুম্পার ওরকম কোনো দাগ-টাগ হয়নি। তবে তখন তার বয়স ছিল পঁচিশ, পেটে কতটুকুই বা চর্বি ছিল? আর এখন সাঁয়ত্রিশ। শরীর যে একটু ভারী হয়ে গেছে সেটা তো অস্বীকার করা যায় না।

কানু স্কুল থেকে ফিরল প্রতিদিনের মতোই, দুটোয়। এবার ওরা একসঙ্গে বসে ভাত খাবে। গত সাতমাস একজন রাঁধুনি আসছে বাড়িতে। সেই মাসিই দু-বেলার রান্না রেঁধে দিয়ে চলে যায়। খাওয়ার সময় টুম্পা শুধু সেগুলোকেই গরম করে নেয় আর হ্যাঁ, চিকেন, বিট, গাজর, ব্রকোলি এইসব দিয়ে একটা স্যুপ বানায় নিজের জন্যে। ওই অখাদ্য জিনিসটা কানু খেতে চায় না, কিন্তু টুম্পাকে তবু বানাতেও হয়, খেতেও হয়। ডাক্তারবাবুর নির্দেশে। মাসি ওই বিজাতীয় জিনিসটা ঠিক বানাতে পারে না, তাই টুম্পা নিজেই ওটা খাওয়ার সময় বানিয়ে নেয়।

আজকেও অল্প মাখনে চিকেন আর সবজির টুকরোগুলোকে সাঁতলে নিয়ে চিকেন স্টকের মধ্যে ফুটতে দিয়েছিল টুম্পা। তারপর উঠোনের তার থেকে শুকনো জামাকাপড়গুলো তুলে আনতে গিয়েছিল। কানু ওর ঘরে বসে একটা ছবির বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল। জামাকাপড়গুলো তুলে এনে টুম্পা কড়াই থেকে স্যুপটা বোলের মধ্যে ঢালতে গিয়ে দেখল অন্যান্য সবজির টুকরোর মধ্যে মিশে রয়েছে চারটে গোল সবুজ ফল। খেয়াল না করলে ক্যাপসিকামের টুকরোর থেকে আলাদা করা মুসকিল। ওগুলো ধুতরোর ফল। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে যে ওগুলোকে কড়াইয়ের মধ্যে ফেলেছে তাকে ফল তুলতে বেশি দূরে যেতে হয়নি। বাগানের পেছনের বেড়ার গায়েই একটা ধুতরোর ঝোপ রয়েছে। এর পর খেতে বসে আর কিছু খেতে পারল না টুম্পা। ভাতগুলোকে নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ল।

উঠে পড়ল, কিন্তু শুল না। ওদের বাড়ির রোয়াকে পুরোনো কাঠের তাকে এখন তিনজোড়া দামি জুতো — মেয়েদের। বিশেষভাবে দেখেশুনে কিনে এনেছেন তড়িৎবাবু। ফ্ল্যাট হিল, গভীর গ্রিপ। টুম্পার পা যাতে কিছুতেই না পিছলোয় তার জন্যেই এই সতর্কতা। কানুকেও উনি একইসঙ্গে দামি একজোড়া জুতো কিনে দিয়েছেন। সে-ব্যাপারে ওঁর কোনো কার্পণ্য নেই। সে যাই হোক, ওই তিনজোড়ার মধ্যে থেকেই একজোড়া পায়ে গলিয়ে উঠোনে নামল টুম্পা। গ্রিলের গেটটায় তালা লাগাতে-লাগাতে, গলা তুলে বলল, কানু! আমি ঘণ্টাখানেক ঘুরে আসছি। তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ো না। কেউ ডাকলে তালা খুলে দেবে না।

কানুর কাছে ডুপ্লিকেট চাবি থাকে। তবে নিতান্তই স্কুল থেকে ফিরে যদি দেখে মা বাড়িতে নেই, তবেই সেটা ব্যবহার করে ও। না হলে করে না।

এই পাড়ারই তিনজন গিন্নি গলির মুখে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। টুম্পাকে আসতে দেখে তিনজনেই ছোঁয়াচ বাঁচানোর মতন করে সিঁটিয়ে সরে গেল। টুম্পা ওদের পেরিয়ে দু-পা যাবার পরেই, সে শুনতে পায় এমনভাবে ওদের মধ্যে একজন বলল, পাড়াটাকেই বেশ্যাপাড়া বানিয়ে তুলল যে রে!

অন্য আর একজন বলল, বেশ্যারও অধম। সে মাগিরা আর যাই করুক, পেট বাঁধিয়ে ঘুরে বেড়ায় না।

তৃতীয়জন কী বলল শুনতে পেল না টুম্পা, কারণ ততক্ষণে সে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল।

বড়ো রাস্তার মুখ থেকে একটা রিকসা ধরে টুম্পা বলল খেয়াঘাটে চলুন।

# # # # #

এখন নদীর বুকে নতুন ব্রিজ তৈরি হয়ে গেছে। খেয়া নৌকা ওপারে যায় না, তবু খেয়াঘাট নামটা রয়ে গেছে। রিকসাকে অপেক্ষা করতে বলে টুম্পা সরু পিচরাস্তা ছেড়ে পাড়ের মাটিতে নেমে এল। ঘাসজমি ধরে কিছুটা হাঁটতেই পৌঁছিয়ে গেল পুরোনোদিনের ইট দিয়ে বাঁধানো ঘাটে।

জোয়ার আর ভাটার মাঝামাঝি সময়ে তখন নদীর জল শান্ত। তবু স্রোত যে সামান্য হলেও রয়েছে তা বোঝা যায় শুধু ধীরগতিতে ভেসে চলা কিছু কচুরিপানার দলের দিকে তাকালে। একটা আশশ্যাওড়ার ঝোপ

ঘাটোয়ালের ভেঙে পড়া ঘরটাকে এই কয়েক বছরেই প্রায় ঢেকে ফেলেছে। গাছটার পাতার আড়ালে বসে একটা ঘুঘু পাখি বিষণ্ণ-মধুর সুরে ডেকে চলেছিল। তা ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিল না কোথাও।

ঘাটের শেষ রানাটার ওপরে নিঃশব্দেই বসে ছিল একজন মানুষ। একটা বেকারির পাঁউরুটি থেকে টুকরো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে পায়ের কাছে ছড়িয়ে দিচ্ছিল আর প্রায় তার গায়ে-মাথায় বসেই সেই টুকরোগুলোকে খুঁটে খাচ্ছিল একঝাঁক চড়াইপাখি। টুম্পাকে এগিয়ে আসতে দেখে পাখিগুলো একসঙ্গে কলকল আওয়াজ করে উড়ে গেল আর তাদের অমন করে ভয় পেতে দেখে মুখ ফিরিয়ে তাকাল সেই লোকটা। তার মুখেও ফুটে উঠল ভয়। তবে টুম্পা আর একটু কাছে আসতে ভয়ের জায়গা নিল একটা পালাই-পালাই ভাব। সেটা বুঝতে পেরেই টুম্পা দ্রুত আর দুটো ধাপ পেরিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। খর গলায় বলল, চিনতে পারছ?

মানুষটার বয়স হবে প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। পরনে একটা তেলচিটে নোংরা শার্ট আর ছেঁড়া ট্রাউজার। গলায় গামছা জড়ানো। মুখ ভরতি দাড়িগোঁফ আর মাথায় জট-পড়া চুলের বোঝা। অস্থির চোখের দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায় মানুষটা বদ্ধ উন্মাদ না হোক, ছিটগ্রস্ত।

টুম্পা কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা নদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতেই টুম্পা বলল, আমাকে চিনতে পারছ না? নিজের বউকে? টুম্পার গলায় একটু আগের সেই ঝাঁঝ আর ছিল না। কান্নার বাষ্প এসে তার কথাগুলোকে অস্পষ্ট করে তুলেছিল। লোকটা হঠাৎ হাতের পাঁউরুটির টুকরোটা জলের বুকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। যেভাবে টুম্পার দিকে না তাকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় টুম্পার কাছ থেকে পালানোই এখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য। টুম্পা লোকটার কনুই চেপে ধরে ফিশফিশ করে বলল, আমাকে চিনতে না পারো, কানুকে মনে পড়ে? তোমার ছেলেকে?

রুখে-ওঠা লোকটা এই কথায় হঠাৎ শান্তভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল টুম্পার মুখের দিকে। অদ্ভুত স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ?

কেমন আছি? কেমন আছিইই? টুম্পার গলার স্বর চড়তে শুরু করল।

হঠাৎই লোকটার একটু আগের উন্মাদনা যেন টুম্পাকে ভর করল। দুহাতে ওর শার্টের কলার খিমচে ধরে প্রায় চিৎকার করে উঠল, সেয়ানা-পাগল তুমি। আমি কিছু বুঝি না, তাই না? তুমি, তুমিই আমাকে খুন করার চেষ্টা করছ।

না না না না না। লোকটা ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে ঘাড় নাড়ছিল আর বলছিল, আমি না, আমি না।

টুম্পা ওর শার্টের কলার ছেড়ে দিয়ে দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল। কান্নার দমকে ওর শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। একটু বাদে যখন মুখ থেকে হাত সরাল তখন দেখা গেল ওর গালদুটো চোখের জলে ভিজে। টুম্পা আপনমনেই বলল, না। তুমি নও। তুমি হতে পার না। কিন্তু তাহলে কে?

লোকটা একমনে টুম্পাকে দেখছিল। ওর কথাগুলো বুঝবার চেষ্টা করছিল। তারপর হঠাৎই কী জানি কী ভেবে দুটো নোংরা হাতের চেটো বুলিয়ে টুম্পার গাল থেকে গড়িয়ে পড়া চোখের জল মুছে দিল। টুম্পা শক্ত করে ওর হাতদুটো নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে বলল, শোনো ইন্দ্র। তুমি শুধু আর কটাদিন বেঁচে থাকো। আমি তোমাকে সারিয়ে তুলবই। সেইজন্যেই টাকার জোগাড় করছি।

তারপর ওর একটা হাত নিজের পেটের ওপরে রেখে বলল, দ্যাখো, পেটটা দ্যাখো আমার। বুঝতে পারছ কিছু?

এই প্রথম টুম্পার পাগল বরের মুখে হাসি ফুটল — অনাবিল এক হাসি। এক লহমার জন্যে। তারপর তার চোখের স্বচ্ছ দৃষ্টিকে আবার ঢেকে দিল উন্মাদরোগের পুরু সর। আবার সে জলের ধারে গিয়ে বসল। খোলামকুচি কুড়িয়ে ছুড়তে শুরু করল কচুরিপানার দলের দিকে।

টুম্পা অপেক্ষমাণ রিকসায় ওঠার আগে ভালো করে ওড়নার খুঁট দিয়ে চোখ মুছে নিল।

# # # # #

'মরুক মরুক মরুক মরুক মরুক।'

গ্রিলের গেটের তালা খোলার আগেই টুম্পা দেখল গেটের বাইরে, বাঁদিকের থামটার গায়ে বড়ো বড়ো করে শব্দগুলো লেখা আছে।

সাদা কলি-করা থামের গায়ে সম্ভবত ইটের টুকরো দিয়ে লেখা। খুবই বিশ্রী হস্তাক্ষর, কিন্তু ওই লেখা কানুর নয়। কানুর হাতের লেখা টুম্পার চেনা।

তাহলে কে?

কে লিখল? কে আমার মৃত্যুকামনা করছে? আমার, নাকি যে আমার পেটের মধ্যে বড় হচ্ছে, তার?

এই একটাই প্রশ্ন টুম্পার মাথায় ক্রমশ এত জোরে পাক খেতে শুরু করল যে, সে কোনো রকমে ওই থামটার গায়ে হাতের ভর দিয়েই পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচল। মাথা ঘোরাটা একটু কমলে টুম্পা কোনো রকমে গ্রিল গেটের তালা খুলে ঘরে ঢুকেই প্রথমে বোতল থেকে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেল। কানু ওর বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। টুম্পা কানুর পাশে শুয়ে ওর পিঠে মুখ গুঁজে দিল। নাকে এল কানুর গায়ের গন্ধ। মনটা একটু শান্ত হয়ে এল। কানুকে জড়িয়ে ধরেই ঘুমিয়ে পড়ল টুম্পা।

যখন ঘুম ভাঙল তখন বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু আলো জ্বালা হয়নি। কানুও বোধহয় একটু আগেই জেগেছে। টুম্পা বুঝতে পারল কানু ওর গলা জড়িয়ে ধরে ওর মুখের দিকেই তাকিয়ে শুয়ে রয়েছে।

টুম্পাকে তাকাতে দেখে কানু ওকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরল। তারপর ফিশফিশ করে বলল, আমার ভয় করছে, মা!

কেন বাবা? টুম্পা জিজ্ঞেস করল।

একটা হাত।

কোথায় হাত? কার হাত?

একটা হাত গেটের বাইরে দেয়ালে ঘস-ঘস করে কীসব লিখছিল। কানু বলল।

টুম্পা উত্তেজনায় উঠে বসল। বলল, হাত দেখলি, লোকটাকে দেখতে পেলি না? তারপর একটু ভেবে বলল, লোক না মেয়েছেলে?

কানু অসহায়ের মতন মুখ করে বলল, সেসব তো কিছু দেখতে পাই না। শুধু হাতটাকেই দেখতে পাই। রোগা মতন, ফর্সা। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে তোমার স্যুপের মধ্যে ধুতরোর ফল মেশাচ্ছিল। ওই হাতটাই সেদিন কলঘরে পাথর ছুড়ে মেরেছিল।

টুম্পা হাঁ করে অনেকক্ষণ কানুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেটা তাহলে সব জানে? ওর কাছে কিছুই লুকোনো নেই? কিন্তু ও যা বলছে সেটা তো ভূতের গল্প। সেটা তো বিশ্বাস করা যায় না। টুম্পা শক্ত মুঠিতে কানুর হাতের কবজিটা চেপে ধরে বলল, সত্যি করে বল। কাকে দেখেছিলিস? তোর বাবা?

কানুর মুখটা ব্যথায় বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল। কোনোরকমে বলল, না মা। সত্যি বলছি, আমি কাউকে দেখতে পাইনি। একটা হাত শুধু হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে...।

টুম্পার মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠেছিল। ও কানুর হাতটা ছেড়ে দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। সন্ধেটা কোনোরকমে এটা ওটা করে, কিছুটা টিভি দেখে, কিছুটা বই পড়ে কাটাল। রাত দশটা নাগাদ খাবার গরম করে কানুকে খাইয়ে দিল, নিজেও খেল।

পাশাপাশি দুটো ঘরের মধ্যে একটায় টুম্পা আর কানু শোয়। ইন্দ্র যখন বাড়িতে থাকত, তখন সে পাশের ঘরটায় শুত। এখন রাতে ওই ঘরের দরজায় বাইরে থেকে শেকল তোলা থাকে। নিজেদের শোবার ঘরে বিছানা করে কানুকে শুইয়ে দিল টুম্পা। অপেক্ষা করল, কতক্ষণে কানু ঘুমোয়। তারপর বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে মোবাইলে তড়িৎবাবুকে ধরল। চাপা গলায় বলল, একটা কথা খুব পরিষ্কার করে জানতে চাইছি। আপনি কি দিদিকে বাধ্য করেছিলেন এই ব্যাপারটা মেনে নিতে? জোর করেছিলেন তার ওপরে?

ওদিক থেকে তড়িৎবাবু প্রশ্ন করলেন, এমন কথা টুম্পা কেন ভাবছে। টুম্পা তার উত্তরে গড়গড় করে বলে গেল আগের দিন আর সেদিনের সব ঘটনাগুলো। তারপর বলল, আমি একজনের কথাই ভাবতে পারছি, যিনি এসব করতে পারেন। তিনি আপনার স্ত্রী, আমার দিদি। কাল রাতে কি ওঁর নাইট-ডিউটি ছিল?

উলটোদিক থেকে তড়িৎবাবু উত্তর দিলেন, ছিল। কিন্তু একজন সিনিয়র এডিটর রাত একটার সময় খবরের কাগজের অফিস থেকে বেরিয়ে লোকের বাড়ির বাগানে দাঁড়িয়ে পাথর ছুড়বে, এটা খুবই অবিশ্বাস্য নয় কি? আর আজ ও সারাদিন বাড়িতেই রয়েছে। রেস্ট ডে। কাজেই ভূতুড়ে লেখাটা ওর নয়।

একটু থেমে তড়িৎবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি একবার তোমার ওখান থেকে ঘুরে আসব?

টুম্পা আতঙ্কিত স্বরে বলল, দোহাই। না। এমনিতেই আমাকে অনেক সহ্য করতে হচ্ছে। এই রাতদুপুরে বাড়িতে ঢুকে আর পাড়ায় আমার সুনাম বাড়াবেন না। আমি একাই সামলে নেব।

# # # # #

সেই রাতেই ঘুমোনোর পরে টুম্পা একটা স্বপ্ন দেখছিল। দেখছিল, ও আর ইন্দ্র সেই জোয়ার-ভাটার মাঝখানের শান্ত নদীটার স্রোতে একটা নৌকা ভাসিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। স্বপ্নের মধ্যেও টুম্পা উদবিগ্ন হচ্ছিল — কানু কই? এই নৌকায় তো কানুরও থাকার কথা। নৌকা থেকে মুখ বাড়িয়ে নদীর জলের দিকে তাকাল টুম্পা। কানু জলে পড়ে যায়নি তো?

হঠাৎই জলের নীচে একটা হাতের নড়াচড়া টের পেল সে। রোগা ফরসা একটা হাত। শুধুই একটা হাত, বাকি শরীরের কিছুই নেই। টুম্পা অবাক হয়ে দেখছিল হাতটাকে। হঠাৎই হাতটা নদীর জলে আগুন ধরিয়ে দিল।

এখন নৌকার চারিদিকে আগুন। জল নয়, নদী জুড়ে বয়ে চলেছে আগুনের স্রোত। পোড়া গন্ধ পেল টুম্পা। ইন্দ্রকে কোথাও আর দেখা যাচ্ছিল না। ইন্দ্র কি তাহলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল?

গায়ে আগুনের তাপ লাগতেই টুম্পা চিৎকার করে উঠে বসল। ঘুম ভেঙে গেল তার। দেখল মশারিটা জ্বলতে-জ্বলতে, গলতে-গলতে ছোটো হয়ে যাচ্ছে। বিছানার চাদর জ্বলছে, জ্বলছে জানলার পর্দা। স্বপ্ন নয়, সত্যিই জ্বলছে। সারা ঘরে আগুনের লাল আভা নেচে বেড়াচ্ছে। ওর চোখের সামনেই আগুনের আঁচে টিভির স্ক্রিনটা শব্দ করে চৌচির হয়ে গেল। টুম্পা সেদিক থেকে চোখ না সরিয়েই বিছানায় ওর পাশের জায়গাটার দিকে আন্দাজে হাত বাড়াল। ডাকল কানু ওঠ, কানু! আগুন লেগে গেছে ঘরে। তারপর আতঙ্কিত চোখে দেখল, কানু নেই। টুম্পা কানুউউ বলে একটা আর্তনাদ করে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ঘরের এই দরজাটায় শোবার আগে সে খিল লাগিয়ে শুয়েছিল। এখন খোলা পেলো। তার মানে কানু বেরিয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় কানু?

রোয়াকে নেই। পাশের ঘরটায় শেকল তোলা, তবু টুম্পা একবার শেকল খুলে ভেতরে উঁকি মারল। না, নেই। রান্নাঘরে তার ছেলে নেই, কলঘরেও না। অথচ রোয়াকের গ্রিলের গেটে ভেতরদিক থেকে তালা আটকানো রয়েছে। রান্নাঘরের পেছনের দরজার গায়েও ভেতর দিক থেকে খিল আটকানো। কানু তো বাইরে বেরোয়নি।

হঠাৎ টুম্পার মনে হল, কানু ওই ঘরেই নেই তো? খাটের তলায়, অজ্ঞান অবস্থায়? সে কি জ্বলন্ত ঘরে ছেলেকে ফেলে রেখে বেরিয়ে এল? টুম্পা আর কিচ্ছু না ভেবে আবার ওদের শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল। খাটের তলায় উঁকি মেরে দেখল, না, কানু ওখানে নেই। এই ঘরে কানু নেই। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে টুম্পা যখন ঘর থেকে বেরোতে যাবে তখনই ঘরটার ইলেকট্রিক ওয়ারিং-এ আগুন ধরল।

এবার আর লাল নয়, তীব্র নীল শিখার মালা দুলে উঠল চারিদিকে আর তার সঙ্গে দমবন্ধ করে দেওয়া একটা ঝাঁজালো ধোঁয়ায় ভরে গেল সেই ঘর। বেরোনোর দরজায় তখন আগুনের পর্দা। ঠিক দু-হাত দূরে দাঁড়িয়ে টুম্পা বুঝতে পারল সে আর কখনোই এই ঘরটা থেকে বেরোতে পারবে না। নিজের চুল পোড়ার গন্ধ পেল টুম্পা, আর একটা শব্দ পেল। তার মনে হল গ্রিলের গেটটা কেউ বাইরে থেকে পিটিয়ে ভাঙছে।

# # # # #

গ্রিলের গেটটা ভেঙে ঢোকার পরে তড়িৎবাবু পরপর তিনটে কাজ করলেন। প্রথমে হাত বাড়িয়ে মেনসুইচটা অফ করলেন। তারপর দমকলে ফোন করলেন। ইতিমধ্যে ওঁর ড্রাইভারের চিৎকারে পাড়ার লোকেরা বেরিয়ে এসেছিল। তারা আসার আগেই উনি ওয়াশরুমের ভেতর থেকে এক বালতি জল এনে কিছুটা খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে ছুড়ে দিলেন টুম্পাদের শোবার ঘরের ভেতরে। কিছুটা নিজের মাথায় ঢাললেন। তারপর ঢুকে পড়লেন ঘরের মধ্যে।

ঘর থেকে উনি টুম্পাকে পাঁজাকোলা করে বাইরে নিয়ে এসে রোয়াকেরই একপাশে শুইয়ে দিলেন। টুম্পা কোনোরকমে চোখ খুলে বলল, কানু কোথায়? ওকে খুঁজে বার করুন। নাহলে আমি এই বাড়ি থেকে বেরোবো না। তড়িৎবাবু অবাক হয়ে বললেন, কানু বাড়িতে আছে! তারপর মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে একবার চট করে পুরো বাড়িটা দেখে নিয়ে সোজা ঢুকে গেলেন কলঘরে। চৌবাচ্চার পাশে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে খুব শান্তগলায় ডাকলেন, কানু, উঠে এসো। ঠান্ডা লেগে যাবে। তারপর আর সময় নষ্ট না করে জলের মধ্যে দু-হাত ডুবিয়ে কানুকে তুলে আনলেন।

ঠিক তখনই ফায়ার-ইঞ্জিনের তীব্র হুটারের শব্দ গলির মুখে এসে পৌঁছোল।

# # # # #

এই পুরো ঘটনাটাই আমি শুনলাম খোদ তড়িৎকুমার সান্যালের মুখ থেকে, ব্যবসার কাজে যিনি আমাদের অফিসে প্রায়ই আসেন। একরকমের বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে বলেই এত কথা আমাকে বললেন তিনি।

উনি বলেছিলেন, বিয়ের বছর-দুয়েক বাদেই কোনো এক কঠিন অসুখের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তাঁর স্ত্রীর জরায়ু অস্ত্রোপচার করে বাদ দিতে হয়। পিতৃত্বের টানে মিস্টার তড়িৎ সান্যাল ঠিক করেন, অন্য কোনো নারীর জরায়ুতে নিজেদের সন্তানের ভ্রূণ রোপণের মাধ্যমে সন্তানলাভের যে-ব্যবস্থা রয়েছে, তারই দ্বারস্থ হবেন।

মিস্টার এবং মিসেস সান্যালের শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলনে ল্যাবরেটরিতে যে ভ্রূণের জন্ম হল তা রোপণ করা হল টুম্পার জরায়ুতে। অর্থাৎ পরিভাষায় টুম্পা হল মিস্টার সান্যালের সন্তানের সারোগেট-মাদার।

টুম্পা ছিল ওঁর স্ত্রীয়ের দূরসম্পর্কের বোন। মেয়েটির স্বামীর হঠাৎই স্মৃতি হারিয়ে যেতে শুরু করে। ব্যয়বহুল এক চিকিৎসার কথা বলেন ডাক্তারেরা, অথচ ওরা ছিল বেশ গরিব। এসব জেনেই তড়িৎবাবু আর ওঁর স্ত্রী টুম্পাকে অনুরোধ করেন সারোগেট মাদার হবার জন্যে। ভারতীয় আইনে আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকলে কারুর পক্ষে সারোগেট-মাদার হওয়া শক্ত। অবশ্য অর্থের প্রয়োজনে সারোগেসিও আইনত মানা, তবে তড়িৎবাবু ইন্দ্রর চিকিৎসার সমস্ত খরচা দিয়ে দেবেন বলে টুম্পাকে কথা দিয়েছিলেন। স্বামীর প্রতি ভালোবাসা থেকেই টুম্পা সারোগেট-মাদার হতে রাজি হয়েছিল।

এর পর ওই দু-দিনের ঝড়, যার কথা একটু আগে বললাম। ঝড়টা তুলেছিল ওই বারোবছরের ছেলে, কানু। অদ্ভুত এক মানসিক রোগের শিকার হয়েছিল ছেলেটা, যার নাম এলিয়েন হ্যান্ড সিনড্রোম। এই অসুখে রুগি নিজেরই কোনো একটা অঙ্গকে দেখে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করতে। তড়িৎবাবুর ধারণা, প্রথমদিনে মাকে ওয়াশরুমে যেতে দেখেই কানু রান্নাঘরের পেছনের দরজা খুলে বাগানে বেরোয় এবং ওয়াশরুমের জানলা ভেঙে দিয়ে আবার ওই দরজা দিয়েই ভেতরে ঢুকে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে।

তার আগে কুকুরছানাটাকে যে ওই মেরেছিল, সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

টুম্পার খাবারে ধুতরোর ফলটা কানু নিশ্চয়ই ঘরের ভেতরে বসেই মিশিয়েছিল। হয়তো স্কুলব্যাগে লুকিয়েই ওর বাঁ-হাত সেই ফল নিয়ে এসেছিল।

হ্যাঁ, কানু বলেছিল ওর বাঁ-হাতটাই নাকি ওর নিজের নয়। সেটা অন্য কারুর হাত। সেই হাত ওর কথা শোনে না।

বাঁ-হাত দিয়েই ও বাড়িতে ঢুকবার মুখের দেয়ালে লিখেছিল, মরুক, মরুক, মরুক। বাঁ-হাতের লেখা বলেই টুম্পা নিজের ছেলের হাতের লেখা চিনতে পারেনি।

আর সবশেষে কানু মায়ের শোবার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চৌবাচ্চার জলে নাকটুকু বার করে ডুবে ছিল। তড়িৎবাবু আমাকে বলেছিলেন, কানু নাকি বলেছিল, একমাত্র জলে ডুবিয়ে রাখলেই সেই অচেনা বাঁ-হাতটা আর কোনোরকম বদমাইশি করতে পারে না। এটা ও আগেই দেখেছিল।

তো এই হল গল্প। আমি সব শুনে বলেছিলাম, এমন কি হতে পারে যে, টুম্পাকে অসতী ভেবে পাড়ায় যে গুঞ্জন, তারই কিছু-কিছু বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়ে-থাকা ছেলেটার কানে ঢুকেছিল আর সেখান থেকেই ওর অবচেতন মনে টুম্পার গর্ভস্থ বাচ্চাটাকে কোনোভাবে নষ্ট করার ইচ্ছে জন্ম নেয়? তড়িৎবাবু বললেন, একদমই তাই। যে সাইকোলজিস্ট কানুর চিকিৎসা করেছিলেন তিনিও একই কথা বলেছিলেন।

এখন ওরা সবাই ভালো আছে। ইন্দ্র বাড়ি ফিরেছে। একদম আগের মতন না হলেও অনেকটা স্মৃতিই ফিরে এসেছে ওর। কানুর অসুখটা খুব সামান্য কয়েকদিনই স্থায়ী হয়েছিল। কাউন্সেলিং-এর মধ্যে দিয়ে ওকে সারিয়ে তোলা গিয়েছিল।

টুম্পাকে কলকাতায় একটা দোকানে সেলস-গার্লের কাজ খুঁজে দিয়েছেন তড়িৎবাবু। সে স্বামীপুত্র নিয়ে এখন কলকাতাতেই থাকে। তড়িৎবাবু বুদ্ধিমান লোক। সারোগেট-মাদারের মনে অনেকসময়ই তার গর্ভ থেকে যে-বাচ্চা জন্ম নিয়েছে তার জন্যে একটা টান থেকে যায়। দূরে থাকলে টুম্পার পক্ষে সেই টান কাটানোর কাজটা সহজ হবে।

ও হ্যাঁ, বাচ্চাটার কথা বলতেই তো ভুলে গেছি। দিব্যি ফুটফুটে মেয়ে। নাম গুঞ্জা। গতকাল তার পাঁচবছরের জন্মদিনে বেশ বড়োসড়ো পার্টি দিয়েছিলেন তড়িৎবাবু। সেখানেই তো এসব কথা বললেন আমাকে।

সেই পার্টিতে টুম্পাকে দেখিনি।

* * *

বেদিয়াটোলির বিদেহী

শহরটার আসল নাম বলতেই পারতাম। মাত্র কুড়ি-বছর আগেই তো ছিলাম সেখানে, যদিও ছিলাম মাত্রই একবছর। তারপরেই পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। তবু এত তাড়াতাড়ি একটা শহরের নাম তো আর কেউ ভুলে যায় না। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করছে না। বলতে গেলেই মনে হচ্ছে মেয়েদের চেঞ্জরুমের মধ্যে গোপন-ক্যামেরা বসানোর মতন একটা বড়োসড়ো পাপ করছি। কারণ, আর-কেউ না জানুক আমি তো জানি, ওই শহরে তার যাবতীয় শোক নিয়ে একটা মেয়ে এখনও লুকিয়ে রয়েছে। কী দরকার তাকে প্রকাশ্যে আনার? তাই সবারই বরং একটা করে কাল্পনিক নাম দিই— শহরটার, মেয়েটার, মেয়েটার বাবার।

ধরুন শহরটার নাম আন্ধোয়াল। 'অন্ধকার', 'অন্তরাল' ইত্যাদি বেশ কয়েকটা শব্দ মিলিয়ে-মিশিয়ে এই-মুহূর্তে ওই নামটাই মাথায় আসছে।

পাটনা থেকে একশো-ত্রিশ কিলোমিটার পশ্চিমে, সত্যিই এরকম একটা ছোটো শহর রয়েছে। আপনারা কখনও গেলে দেখবেন, শহরের গা ঘেঁষে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা। নদীর ওপারে উত্তরপ্রদেশ। অর্থাৎ গঙ্গাই ওখানে দুই রাজ্যের সীমারেখা টেনেছে।

পতিতোদ্ধারিণীর তীরে অবস্থান; তবু অন্তরে-বাহিরে এত নোংরা শহর আপনারা কমই দেখতে পাবেন।



খোলা নর্দমা, প্লাস্টার বিহীন ত্যাঁড়াবেঁকা সব মকান, খোয়া-খোবলানো সরু সরু রাস্তা আর যথেচ্ছ ঘুরে-বেড়ানো শুয়োরের পাল নিয়ে তার বাইরের রূপ যেমন কুশ্রী, তেমনই ধান্দাবাজ, অপরাধপ্রবণ আর ইন্দ্রিয়পরায়ণ সেখানকার মানুষজন। যেন তাদের পাপের কথা প্রচার করার জন্যেই আন্ধোয়ালে প্রতিটি রাস্তার ধারে, প্রতিটি পাঁচিলের গায়ে মোটা মোটা চুনের পোঁচড়ায় যে-বিজ্ঞাপন চোখে পড়ত, তা হল যৌনরোগের ইলাজের বিজ্ঞাপন। শিল্প নয়, বাণিজ্য নয়, বিনোদন নয়, শুধুই যৌনরোগ আর লিঙ্গশিথিলতা।

নদীর এপারে দাঁড়ালে ওপারটাকে ধোঁয়া-ধোঁয়া লাগত। বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে-মধ্যে দেখা যেত যোজনব্যাপী চর; আর চর মানেই তো উদ্দাম অপর্যাপ্ত ফসল, যে-ফসলের মালিকানা নির্ধারিত হত স্রেফ লাঠি, সড়কি আর মুঙ্গেরী বন্দুকের জোরে। চরজমির দখল নিয়ে আন্ধোয়ালে তাই নিত্য মারদাঙ্গা খুনখারাপি লেগেই থাকত।

তা ছাড়া সমস্ত রক্তপাতের পেছনেই প্রচ্ছন্ন থাকত রাজপুত আর ভূমিহারদের জাতি-বৈরিতা। অবশ্য একজায়গায় এই দুই উচ্চবর্ণের মিল ছিল দারুণ। শহরের দলিত-সম্প্রদায়ের গরিব মানুষগুলোকে দু-তরফের জোতদারেরাই ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছিল। সে-কথায় পরে আবার ফিরতেই হবে আমাদের। এখন শুরুর কথাগুলো বলি।

ব্যাংকের চাকরিটা পাওয়ার পরে আমার প্রথম পোস্টিং হল ওই আন্ধোয়াল শহরে। যারা আমার মতন চাকরিতে নতুন, তখনও পায়ের নীচে জমি খুঁজে পায়নি, তাদেরই ওখানে পোস্টিং হত। তা ছাড়া আর কেউ মধ্যযুগীয় বর্বরতায় ভরা, নোংরা শহরটায় যেতে রাজি হত না।

আমি আর আমার সহকর্মী মানিক হালদার, সেও আমার মতনই জুনিয়র ক্লার্ক, দুজনে মিলে শহরের উত্তরপ্রান্তে একটা বাড়ি ভাড়া নিলাম। জায়গাটার নাম বেদিয়াটোলি। শুনেছিলাম, আমরা যাওয়ার বছর দশেক আগেও ওখানে অন্ত্যজ বেদিয়াদের একটা টোলি, মানে বস্তি ছিল। উচ্চবর্ণের রাজপুত কিংবা ভূমিহারদের বাড়ির কুয়ো থেকে জল নেওয়া বা এরকমই কোনো ক্ষমাহীন অপরাধের কারণে তাদের সেই বস্তি রাতারাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আগেই বলেছি, দুসাদ, বেদিয়া, চামারদের মতন দলিতদের বস্তিতে আগুন লাগাবার আগে ওখানকার উচ্চবর্ণের জোতদারেরা দুবার ভাবত না। খুন-ধর্ষণও ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা।

দু-কামরার একতলা বাড়িটা আমরা খুবই কম ভাড়ায় পেয়ে গিয়েছিলাম, কারণ, ওই বেদিয়াটোলি জায়গাটায় পাকা-রাস্তা, নর্দমা, স্ট্রিট-লাইট এসবের বালাই ছিল না। জায়গাটাকে শহরের বাইরেই বলা চলে। আমাদের ভাড়াবাড়িটা ছিল নদীর ধারে। সামনের রাস্তাটা পেরিয়ে বড়োজোর দশ-পা হাঁটলেই গঙ্গা।

বাড়িটার পেছনের দিকে ছিল আর একটা পোড়ো জমি। ঘরটা ভাড়া নেওয়ার পরের দিনই আমরা দুজনে একবার ওই জমিটা এক্সপ্লোর করতে গিয়েছিলাম। যা দেখেছিলাম, তাতে মনটা ভারি দমে গিয়েছিল।

দেখেছিলাম, ঘন কাশের ঝোপের আড়ালে তখনও অনেক কাঁচা-ঘরের ভাঙা দেয়াল, পুড়ে যাওয়া বাঁশ আর কাঠের চালা, এমনকি কিছু মাটির বাসন-কোসনের টুকরো অবধি পড়ে রয়েছে। ওই মাঠটা জুড়েই যে এককালে বেদিয়াদের বস্তি ছিল, তা বুঝতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। এককালে যেখানে মানুষের ঘরবাড়ি ছিল, সেখানে তখন নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বেজি আর বটেরপাখি। পোড়া-বাঁশের খুঁটির ওপরে বসে একটা দাঁড়কাক ডাকছিল। মনে হচ্ছিল, কাশের বনের ভেতরে যেন বহু নারীপুরুষের দীর্ঘশ্বাস ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেই যে পালিয়ে এসেছিলাম, তারপর থেকে বাড়ির পেছনের ওই পোড়ো জমিটার দিকে আমরা স্বেচ্ছায় আর যাইনি। এমনিতে যাওয়ার দরকারও পড়ত না। যাতায়াত যা-কিছু, তা তো বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েই। দুজনে দুটো সাইকেল কিনে নিয়েছিলাম, তাতে চেপেই অফিস, বাজার সব করতাম।

বাড়িটায় যে দুটো ঘর ছিল, তা তো বলেইছি। একটায় আমি থাকতাম, আর অন্যটায় মানিক। আমার ঘরটায় শুধু সামনে আর পাশের দিকে জানলা ছিল। কিন্তু মানিকের ঘরে একটা জানলা ছিল ওই পেছনের জমিটার দিকে মুখ করে। খুব গরমের রাত না হলে মানিক ওই জানলাটা বন্ধই করে রাখত। বাহানা দিত সাপখোপের, কিন্তু আমি জানতাম তা নয়। ও ওই বেদেদের প্রাচীন দীর্ঘশ্বাসকেই ভয় পেত।

# # # # #

আমরা ব্র্যাঞ্চে জয়েন করার পরে-পরেই মার্চ-এন্ডিং এসে গিয়েছিল। আমি আর মানিক দুটো মাস ব্যাংকের লেজার-অ্যাকাউন্ট নিয়ে ভূতের মতন খাটলাম। ওই দুটো মাস আর কিছু ভাববার বা দেখবার অবকাশ পাইনি। তারপর এপ্রিলের গোড়ার দিকে একদিন ভোরবেলায় মানিক আমাকে ঠেলা দিয়ে ঘুম থেকে তুলল। বলল, 'সুমনদা, দেখে যাও, কী অদ্ভুত কাণ্ড'।

ও আমাকে ওর ঘরের জানলাটার সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল। ঘুমচোখে দেখলাম, গত দুমাসে পোড়ো-জমিটার চেহারায় বেশ পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তনটা প্রাকৃতিক। ফেব্রুয়ারি-মার্চে গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুরো জমিটা জুড়ে যে মানুষপ্রমাণ কাশের জঙ্গল ছিল, সেই জঙ্গল শুকিয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল। ফলে, আগে যেসব ধসে-পড়া বাড়িঘর, পোড়া-কাঠামো ইত্যাদি দেখবার জন্যে আমাদের কাশের জঙ্গলে ঢুকে ঘাস সরিয়ে-সরিয়ে চলতে হয়েছিল, তখন সেগুলোর অনেকটাই মানিকের জানলায় দাঁড়িয়েই দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু শুধু এইটুকু দেখার জন্যেই কি মানিক আমাকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে আনল নাকি? এরকম খ্যাপাটে তো ও ছিল না কখনও।

একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'কী ব্যাপার বল তো। আমি তো কিছুই বুঝছি না'।

মানিক বলল, 'ওইদিকটায় দেখো ওইদিকটায়'। এই বলে আমার চোয়ালে ঠেলা দিয়ে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল। বলল, 'এবার দেখতে পাচ্ছ? দ্যাখো, ঘরটায় লোক এসেছে।'

দু-চোখ কচলে আবার মানিক যেদিকে দেখাচ্ছিল, সেদিকে তাকালাম এবং এইবার বুঝতে পারলাম ও আমাকে ঠিক কী দেখাতে চাইছে।

আগেই বলেছি, পোড়োজমিটার মধ্যে আধভাঙা, সিকিভাঙা অনেক ঘরের দেয়াল তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। দেখলাম, সেরকমই একটা ভাঙা-ঘরের মাথায় ঘাসের ছাউনি উঠেছে। ঘরটার দেয়ালের ফুট-ছয়েক মাত্র তখনও কোনোরকমে মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই অবশিষ্ট ছ-ফুট উঁচু দেয়ালের মাথাতেই কেউ চারপাশের কাশবন থেকে ঘাস টেনে নিয়ে গিয়ে একটা যেমন-তেমন ছাউনি দিয়েছে।

মানিক বলল, 'দেখছ? একটু আগে একটা লোক ওটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। লোকটা নড়াচড়া করছিল বলেই ঘরটা আমার নজরে পড়ল। না হলে চারিদিকের ঘাসজমির সঙ্গে তো একদম মিশে গেছে, তাই না?!'

সত্যিই তাই। ঘরটা যেন বটের পাখিদের মতন পোড়োজমির কাশবনের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। প্রশ্ন করলাম, 'লোকটাকে দেখে কেমন বুঝলে?'।

মানিক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দিল, 'সেইজন্যেই তোমাকে আরও ডাকলাম, সুমনদা। লোকটাকে দেখে আমার মানুষ বলেই মনে হল না। কেমন যেন... কেমন যেন একটা খ্যাপা কুকুরের মতন ভয়ংকর জীব মনে হয়েছিল। বিশ্বাস করো, কুকুরের মতোই ওর চোখদুটোও অন্ধকারে জ্বলছিল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে গুঁড়ি মেরে চলতে-চলতে, আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই আবার চার হাতেপায়ে হেঁটে ঘরটার মধ্যে ঢুকে গেল।'

মানিকের কথা শুনে আমারও যে চিন্তা হল না তা নয়। চিন্তাটা ঠিক নেকড়ে-মানুষ বা ওইজাতীয় কিছু নিয়ে নয়। ওসব অলৌকিকে আমার তখনও কোনো বিশ্বাস ছিল না। আমি ভাবছিলাম, কাগজে কিংবা পত্রিকায় কতধরনের মানসিক ভারসাম্যহীন খুনি-টুনির কথা পড়া যায়। যাকে বলে 'সাইকোপ্যাথ কিলার'। 'এই লোকটা সেই গোত্রের নয় তো? না হলে একজন ভিখিরিও তো শুধু মানুষের কাছাকাছি থাকবার জন্যে প্ল্যাটফর্মে কিংবা ফুটপাথে শুয়ে ঘুমোয়। এই লোকটা কেন জঙ্গলের মধ্যে ঘর বাঁধতে এল?

তবু মানিক যেহেতু আমার থেকে বয়সে ছোটো, আর স্বভাবটাও ওর বেশ দুর্বল গোছের, তাই সাহস দিয়ে বললাম, 'চিন্তা কোরো না। আজ তো বুধবার। রোববার ছুটির দিনে দুজনে মিলে একবার ওখানে গিয়ে নতুন প্রতিবেশীর পরিচয় জেনে আসব।'

# # # # #

সেই বুধবারেই অবশ্য আমরা আমাদের কাজের মাসির কাছে একটু খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। জানতাম মাসি খুব ভীতু মানুষ। ভয়ের চোটে কাজ ছেড়ে দিলে আমরাই ফাঁসব। তাই হালকা করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মাসি, ওই বেদিয়াটোলির মাঠে কি কেউ থাকতে এসেছে? তুমি কিছু জানো?'।'

মাসি মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'ওখানে আবার কে থাকতে আসবে? মানুষের কি জানের পরোয়া নেই?!'

বললাম, 'কেন? জানের ভয়ের কথা বলছ কেন?।'

মাসি বলল, 'শুধু আন্ধোয়াল নয়, আশেপাশের আরও চোদ্দোটা গাঁ-গঞ্জের লোকজন জানে, মথুরা সিং-এর লোকেরা সেদিন যে তিনজন বেদিয়া মরদকে খুন করেছিল আর যে মেয়েটাকে বলাৎকার করে জ্বলন্ত চালাঘরের মধ্যে ছুড়ে দিয়েছিল, তারা সকলেই এখনও ওই মাঠেই রয়েছে। এখনও তাদের ওখানে দেখা যায়। এর পরেও কোন জিন্দা আদমির ধক রয়েছে ওই জমিতে পা রাখে? তোমাদেরও হাজারবার বারণ করছি, ওদিকে যেয়ো না কখনও।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাসি বলল, 'পাপ! পাপ! আন্ধোয়ালের মাটিতে বড়ো পাপ গো বাবুরা। আর এটা জেনে রাখো, পাপ থাকলেই প্রেতেরাও থাকবে। দুঃখী আত্মারাই প্রেত হয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে।

বেদিয়াদের কথা এখন খুব মনে পড়ে, বুঝলে দাদাবাবু। সবেমাত্র তার কয়েকমাস আগে বাইরে থেকে এখানে এসে টোলি বসিয়েছিল ওরা। নির্ঝঞ্ঝাট লোক ছিল, আমাদের মতন গরিব লোকেরা যেমন হয়। ঝুড়ি-চুবড়ি বুনত। ছুরি-কাঁচি বানাত। কেউ কেউ শহরের রাস্তায় মাদারির খেলাও দেখাত। তবু এই শহরের গুন্ডাগুলো ওদের রাতারাতি শেষ করে দিল। পাপ নয়?।'

মানিক বলল, 'ওদের দোষটা কী ছিল মাসি?।'

মাসির বয়স হয়েছিল। মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে বলল, 'তোমরা বাচ্চাছেলে, তোমাদের কাছে কী বলি বলো তো? মুখে আমাদের মাতব্বররা বলে, ওদের কুয়ো থেকে জল তুলেছিল, এইসব। কিন্তু আমরা জানি ওসব কিছু নয়। এই আন্ধোয়ালের নিয়ম হচ্ছে, কোনো নীচু জাতের মেয়ে একটু সুন্দরী হলেই তাকে রাজপুত নয়তো ভূমিহারের বিছানায় যেতে হবে। সে কুয়ারী লেড়কি হোক কি শাদিসুদা অওরৎ, কারুর কোনো রাহৎ নেই। আর ওই বেদিয়াদের মেয়েরা ছিল সত্যিই চমক লাগানো সুন্দরী। আমি নিজে মেয়েমানুষ হয়ে বলছি, অমন লচক, অমন ঠমক— ওদের দিক থেকে চোখ ফেরানো মুশকিল ছিল।'

বললাম, 'তারপর?।'

মাসি বলল, 'তখন বড়োজোর দু-তিন মাস হবে, বেদেরা এই আন্ধোয়ালের নরকে পা দিয়েছিল। তার মধ্যে এখানকার জানোয়ারদের খবর ওরা জানবে কেমন করে?

'জানল, যখন গাঙ্গুয়া-জোতের জোতদার মথুরা সিং, লোকটা লকড়বাঘার থেকেও খতরনাক, বেদেদের সর্দার পালকলালের মেয়ে শান্তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে কয়েকটা পোষা গুন্ডা পাঠাল। কিন্তু বেদিয়ারা যেমন জোতদারকে জানত না, তেমনি জোতদারও জানত না, প্রয়োজনে বেদিয়াদের হাতের চাকু বিদ্যুতের মতন চমকায়।

'মথুরার গুন্ডারা প্রথম দফায় কোনোরকমে জান নিয়ে পালাল। তবে একটু বাদেই দল বাড়িয়ে ফিরেও এল আবার। তারপর যা হয়েছিল তা তো আগেই বলেছি। পালকলালের সঙ্গে তার এক বেটা আর এক শাগির্দ খুন হল। পালকলালের বেটি শান্তাকে ওরা বলাৎকার করে জ্বলন্ত ঘরের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। ছোকরা দুটোর লাশ ওরা গঙ্গামাইয়ার বুকে ভাসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পালকলাল আর শান্তার লাশ আগুন থেকে বার করতে পারেনি। পোড়া বডিদুটো ওখানেই পড়ে ছিল, আমি দেখেছি।'

'তারপর?' কোনোরকমে প্রশ্ন করলাম।

'তারপর আর কী? পরেরদিন ভোর হবার আগেই বেদিয়ারাও টোলি খালি করে গায়েব হল। থানা-পুলিশকে চিরকালই গরিবমানুষেরা যমের চেয়েও বেশি ভয় পায়। তবে সবাই কি আর গেল? সবাই তো যায়নি। পালকলাল আর তার সুন্দরী বিটিয়া ওখানেই রয়ে গেছে।' মাসি কথা থামিয়ে ঘর ঝাঁট দিতে শুরু করল।

আমরা চুপ করে বসে রইলাম। কিন্তু মাসিকে সেদিন কথায় পেয়েছিল। তাই একটু বাদেই ঝাঁট দেওয়া থামিয়ে বলল, 'দশবছর কেটে গেল, তবু সেই দৃশ্য ভুলতে পারি না, জানো দাদাবাবু! বেদিয়াদের সর্দার ওই পালকলাল ছিল মশহুর বাজিগর। বুডঢা লোকটা নাকি সম্মোহনও জানত। তাই ওকে মারার আগে ওর চোখদুটো মথুরা সিং-এর লোকেরা বল্লমের ডগা দিয়ে উপড়ে নিয়েছিল। এখনও নাকি ওই পোড়ো জমির মধ্যে বেদিয়া পালকলাল কুকুরের মতন মাটির গন্ধ শুঁকে শুঁকে চলাফেরা করে। চোখে তো দেখতে পায় না বেচারা।''

মাসি ঘর ঝাঁট দেওয়া শেষ করে কুয়োতলায় বাসন মাজতে চলে গেল। আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, মানিক ফ্যাকাশে মুখে বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে। আমাকে তাকাতে দেখে বলল 'সুমনদা! তাহলে ও কাকে দেখলাম? কুকুরের মতন মাটির গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে কে ওখানে ঘুরছিল?।'

আমি মুখের ভাবে যতটা সম্ভব নিস্পৃহতা ফুটিয়ে তুলে বললাম, 'পালকলালকে নিশ্চয়ই দ্যাখোনি। ভূতেদের তো আর কাশঘাসের ছাউনির দরকার পড়ে না। ওই ছাউনি যে দিয়েছে, সে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানুষ। তার গায়ে রোদ-বৃষ্টি লাগে। রোববার অবধি অপেক্ষা করো। সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

# # # # #

অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায়ও ছিল না। ঘুম থেকে উঠে কোনোরকমে নাকে-মুখে দুটি গুঁজে, সাইকেল ঠেঙিয়ে ব্যাংকে রওনা হয়ে যেতাম। তারপর সারাদিন ধরে অশিক্ষিত এবং পয়সার গরমে ধরাকে সরা দেখা আন্ধোয়ালের ধনিক-সম্প্রদায়ের নানারকমের অত্যাচার সামলাতাম। বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হওয়া চলত না। যদিও আমাদের ব্যাংকটা ন্যাশনালাইজড ব্যাংকই ছিল, তবু ওখানে সিকিউরিটি শব্দটা ছিল অর্থহীন।

সেই বুধবারেও, সন্ধে আটটার পরে যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন আমার কিংবা মানিকের আর নড়ার ক্ষমতাও ছিল না। কোনোরকমে দুটো করে ডাল রুটি মুখে গুঁজে, দশটা নাগাদ বিছানায় বডি ফেলে দিলাম।

আশ্চর্য ব্যাপার, হয়তো মনের ভেতরে লুকিয়ে-থাকা উদগ্র কৌতূহলের জন্যেই হবে, অত ক্লান্তি নিয়ে ঘুমোনোর পরেও কিন্তু বৃহস্পতিবার ভোর-রাতের দিকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে, আমি বিছানা থেকে নেমে, চুপিচুপি মানিকের ঘরে ঢুকলাম। ভেবেছিলাম, পেছনের জানলাটা খুলে একবার দেখব, ওই পোড়ো জমিটায় কী হচ্ছে। কিন্তু পাশের ঘরে ঢুকে দেখি, মানিক ইতিমধ্যেই জানলাটার গরাদে মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখের কোনা দিয়ে আমাকে একবার দেখেই আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল। এমন সম্মোহিত-ভঙ্গিতে কী দেখছে ও?

ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম হ্যাঁ, গরাদে মুখ ঠেকিয়েই। আজ আমিও সেই আধা-মানুষ আধা-জন্তুকে দেখতে পেলাম। চার হাতেপায়ে ভাঙা ঘরটার চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে আবার ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে, যদি ওই শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতন আস্তানাকে ঘর বলা যায়। আর তার পরেই আমাদের দুজনের রক্ত হিম করে দিয়ে, ওই খোঁয়াড়ের ভেতর থেকে একটা কান্নার শব্দ ভেসে এল। কোনো কিশোরী-মেয়ের কান্না।

ওরকম কান্না আমি তার আগে কখনও শুনিনি। সেই-কান্নার মধ্যে শুধুই যে সন্তাপ ছিল তা তো নয়, নৈরাশ্যও ছিল। ছিল অকূল এক আশাহীনতা। যেন, যে কাঁদছে সে জানে তার আর মুক্তি নেই ; তার কান্না শুধু কান্নাই থেকে যাবে, লাভ কিছু হবে না।

হয়তো সেইজন্যেই, একটু পরেই কান্নার শব্দটা থেমেও গেল। দু'একবার ফোঁপানির আওয়াজ পেলাম। তারপর তাও রইল না।

সামনের সদর-দরজায় কড়া-নাড়ার আওয়াজে আমাদের সম্মোহন ভেঙে গেল। মাসি এসেছে। তার মানে নিত্যদিনের দৌড় শুরু হয়ে গেল। তবে বুঝতে পারছিলাম, আজ আমাদের কাজকর্মে বারবার ভুল হবে। মাথার মধ্যে থেকে ওই অদ্ভুত লোকটাকে আর অচেনা কান্নাটাকে কিছুতেই আজ তাড়াতে পারব না। কোনোদিনই কি পারব? কে জানে!

মাসিকে দরজা খুলে দিতে যাওয়ার আগে মানিক বেশ জোর দিয়ে বলে গেল, 'সুমনদা, তার মানে শুধু পালকলালই নেই। শান্তাও রয়েছে ওখানে, ওই ঘরে।'

আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না।

উত্তর পেলাম রবিবার ভোরে। সেদিনই শান্তার প্রেতশরীরকে আমরা দুজনেই প্রত্যক্ষ করলাম।

আগের দিন, অর্থাৎ শনিবার সন্ধেবেলায় আন্ধোয়ালের আকাশ দিয়ে একটা কালবৈশাখী বয়ে গিয়েছিল। তার ফলে আমাদের দুটো ক্ষতি হয়েছিল। এক, খুব লো-ভোল্টেজের যে বিহারি বিদ্যুৎটুকু আমরা পেতাম, সেটাও বিদায় নিয়েছিল। আর দুই, আমাদের উঠোনের চানঘরের চালার একটা অংশ উড়ে গিয়েছিল। লাভের মধ্যে গরমটা একধাক্কায় অনেকটাই কমে গিয়েছিল।

হ্যারিকেনের আলোয় দাবা খেলে সন্ধেটা কাটিয়ে তাড়াতাড়ি বিছানায় ঢুকে পড়েছিলাম। মনে আশা ছিল, ঘুমটা জমবে, কারণ একে তো এমন সুন্দর বাদলা ওয়েদার, তার ওপরে পরের দিনটা ছুটির দিন। কিন্তু তা হল না। সবে চোখদুটো জুড়ে এসেছে। রাত তখন কটা হবে? দশটাও বাজেনি বোধহয়। হঠাৎই বুকের রক্ত হিম করে দিয়ে আবার সেই কান্নার শব্দ ভেসে এল। সেই কমবয়সি মেয়ের আকুল কান্না। আজ যেন সেই কান্নার মধ্যে ক্রোধ মিশে ছিল।

বিছানা থেকে ছিটকে নেমে, কোনোরকমে মানিকের ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম, ও ইতিমধ্যেই জানলার পাল্লা খুলে ফেলেছে। জানলার বাইরে নিকষ অন্ধকারে ডুবে ছিল বেদিয়াটোলির মাঠ। কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু দেখার জন্যে আমাদের কোনো উদ্যোগ নিতে হল না। যা দেখানোর ভগবানই দেখালেন। কিংবা শয়তান। জানি না কে।

বৃষ্টির তোড় কমে এলেও তখনও ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সেরকমই এক বিদ্যুতের শিখায় আকাশটা আরও একবার ফালাফালা হয়ে যেতেই আমরা দুজনেই তাকে দেখতে পেলাম। শান্তাকে।

ওই ভাঙা-ঘরের দাওয়ায় ও দাঁড়িয়ে ছিল। রোগা, একহারা চেহারার এক কিশোরী কিংবা সদ্যযুবতী। ওর গায়ে যে একটা শাড়ি জড়ানো ছিল এইটুকু মনে আছে। কিন্তু সেই শাড়ি ছেঁড়া ছিল না পোড়া ছিল, ব্লাউজ পরেছিল কি না, পরে থাকলে কী রঙের, সেসব বলতে পারব না। কারণ, সত্যি কথা বলতে ওসব কিছুই আমরা দেখিনি। দেখা সম্ভব নয়। আমরা দেখেছিলাম ওর মুখ। বিদ্যুতের আলো মিলিয়ে যাওয়ার পরেও, আবার নিকষ অন্ধকারে বেদিয়াটোলির মাঠ ডুবে যাওয়ার পরেও, আমাদের চোখের মণিতে সেই মুখখানা তীক্ষ্ণ কাঁকরের মতন গেঁথে ছিল।

ভ্রূ-হীন, কেশ-হীন, ছোবড়া-ছাড়ানো নারকেলের মালার মতন একটা মুখ। মাথার তালুর পোড়া-চামড়ায় জায়গায়-জায়গায় গোলাপি রং ধরেছে। চোখ দুটো ডিমের মতন বিস্ফারিত, কারণ চোখের পলক শুধু নয়, নরম পাতাদুটোও পুড়ে গেছে। ঠোঁটের চর্বি আগুনে গলে গেছে বলে মাড়ি-সমেত দাঁতের পাটিদুটো বাইরে বেরিয়ে রয়েছে। একটা জান্তব হাসি চিরস্থায়ী হয়ে গেছে ওই পোড়ামুখে। চোখ দিয়ে কান্নার জল গড়ালেও যে হাসি কখনও মিলিয়ে যাবে না।

এ-ই তাহলে মথুরা সিং-এর লোকেদের হাতে রেপড হওয়া সেই মেয়ে, শান্তা বেদিয়া? যে-চেহারা নিয়ে সে মরেছিল, সেই চেহারা নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে এখনও, এই দশবছর বাদেও!

আর একবার বিদ্যুৎ চমকাতেই দেখলাম, ঘরের সামনেটা ফাঁকা। কেউ নেই। কান্নার আওয়াজও ছিল না।

রাতটা না ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলাম। ভোরের আলো ফোটামাত্র মানিকের ঘরে গিয়ে ওর হাত ধরে টান দিলাম। বললাম, 'এই, ওঠো। অনেক সহ্য করা গেছে। শালা, একবিংশ শতাব্দী শুরু হয়ে গিয়েছে, তাও দু-বছর হয়ে গেল। এখনও এইভাবে চুপচাপ বসে ভূত দেখব নাকি?।'

মানিকও বোধহয় ভয় পেতে-পেতে সেই জায়গাটায় পৌঁছে গিয়েছিল, যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ ঘুরে দাঁড়ায়। ঘরের খিলটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'চলো সুমনদা। যদি কোনো এক্সপ্ল্যানেশন পাই ভালো। না হলে ওই চালাঘরে আজ আগুন লাগিয়ে দিয়ে আসব। মাইরি বলছি। তুমি কেরোসিনের বোতলটা নিয়ে নাও।' তারপর নিজের কথাগুলো নিজের কানে ঢোকামাত্রই ও কেমন যেন ভ্যাবলা হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারছিলাম, কেন! আসলে ওই আগুনে পোড়া মেয়েটার চেহারা ওর মনে পড়ে গিয়েছিল। যে মেয়ে একবার আগাপাশতলা পুড়ে গেছে, তাকেই আবার কেমন করে পোড়াবে, সেই কথাই ভাবছিল নিশ্চয়ই।

যাই হোক, ভিজে ঘাস আর জলকাদা মাড়িয়ে সেই ঘরটার কাছাকাছি পৌঁছোতেই এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। ঘরটায় জানলা-টানলা তো কিছুই ছিল না। দরজার সামনেও একটা ছেঁড়া চাটাই ঝুলছিল। তাও সেই লোকটা কেমন করে আমাদের এগিয়ে আসতে দেখল কে জানে! হঠাৎই সে ঘর থেকে বেরিয়ে, চার হাতে-পায়ে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল। তখন ওকে আর ভূত বলে মনে

হচ্ছিল না, কারণ, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম ওর কোমরের ছেঁড়া লুঙ্গিটা জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে।

মানিক রিফ্লেক্স-অ্যাকশনেই হাতের খিলটা মাথার ওপরে তুলে ধরেছিল। লোকটা মাথা বাঁচানোর জন্যে দুটো হাত ওপরে তুলে চিৎকার করে উঠল, 'মারো মৎ, মারো মৎ।' ওর চোখে আতঙ্ক দেখে মানিক আস্তে আস্তে হাতটা নামিয়ে নিল। তারপর নরম-গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে? এখানে কী করছ?।'

লোকটা হাহাকার করে উঠল, 'লুকিয়ে আছি বাবু। আমার দুঃখী মেয়েটাকে বাঁচানোর জন্যে প্রাণের দায়ে এখানে লুকিয়ে আছি। আমাদের কাছে আর এসো না গো, এখান থেকে চলে যাও। না হলে তোমাদের পেছন পেছন ওরাও চলে আসবে' বয়স্ক মানুষটা এর পর জলকাদার ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে, ফুলে-ফুলে কাঁদতে শুরু করেছিল। ওই দৃশ্যের সামনে থেকে আমরা আর নড়তে পারছিলাম না।

কিছুক্ষণ পরে অবশ্য লোকটা উঠে বসল। ওইখানে বসেই যে ঘটনার কথা আমাদের সেদিন শুনিয়েছিল, তা নারকীয় হলেও নতুন কিছু নয়। বিশেষত আন্ধোয়ালে পা রাখার পর থেকে ওরকম ঘটনার কথা আমরাও ততদিনে দু-চারটে শুনে ফেলেছি। তবে কাগজে পড়া, লোকের মুখে শোনা আর ভিকটিমের সামনে দাঁড়িয়ে তার নিজের মুখে শোনা তো এক-জিনিস নয়।

যা শুনলাম, তা যেন সেই দশবছর আগের বেদিয়াটোলির ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। শুধু লোকটা এখানে বেদিয়া নয়, দুসাদ। বিহারের আর এক অন্ত্যজ জাতি। ভিকটিমের নাম পালকলাল নয়, বুধুয়া। রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে বুধুয়া। আর তার মেয়ের নামও শান্তা নয়, লছমী।

বাকি গল্পটা প্রায় এক।

সতেরো-বছরের লছমী ছিল জাতে দলিত এবং রূপে সুন্দরী।

একজন গর্বিত পিতা যেভাবে নিজের মেয়ের রূপের প্রশংসা করে, সেইভাবেই বুধুয়া বলতে শুরু করেছিল কেমন তিলফুলের মতন ছোট্ট টিকোলো একখানি নাক ছিল লছমীর, কেমন টানা-টানা দুটো চোখ ছিল। কেমন ঘন একজোড়া ভুরু ছিল তার মেয়ের আর পিঠে চুলের ঢাল। ভুরুদুটো নাকি আবার ঠিক টিপ পরার জায়গায় এসে জুড়ে গিয়েছিল।

'জানেন বাবুজী,' বুধুয়া বলেছিল, 'বিযুণজী যেন নিজের হাতে আমার লছমীর চিবুকের ঠিক মাঝখানে যত্ন করে একখানা তিল এঁকে দিয়েছিলেন'। বলতে-বলতে ও কেঁদে ফেলেছিল।

ক্লাস এইট অবধি কোনোরকমে মেয়েকে স্কুলে পড়িয়েছিল বুধুয়া। তখনই ওর মা ক্যানসারে মারা গেল। তারপর থেকে বুধুয়া কাজে বেরোলে মেয়ে বাড়িতে একা থাকত আর সেই সুযোগে ওর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে ওকে ফাঁসাল ওদের বস্তিরই একটা ছেলে। তারপর সেই ছেলে লছমীকে নিয়ে গেল একটা বাগানবাড়িতে, যেখানে অপেক্ষা করছিল আন্ধোয়ালের এক বড়ো নেতার ছেলে আর তার ইয়ারবক্সির দল।

টানা সাতদিন ধরে ওই বাগানবাড়িতে হাত-পা বেঁধে ওরা লছমীকে রেপ করে। ওই সাতদিনে মেয়ের খোঁজে বুধুয়া যায়নি এমন কোনো পুলিশ-চৌকি নেই; হাতেপায়ে ধরেনি এমন কোনো নেতা নেই। কিন্তু সবাই ওকে দূর-দূর করে ভাগিয়েছে। সাতদিন পরে বিধ্বস্ত লছমীকে ওরা গলির মুখে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল।

শান্ত বুধুয়া, ভীরু বুধুয়া জীবনে সেই প্রথমবার একটা সাহসের কাজ করল। সে থানায় গেল ওই নেতার ছেলের বিরুদ্ধে এজাহার লেখাতে। এজাহার যে লেখা হল না সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু পরের দিনই বুধুয়ার ঘরে ঢুকে, দিনে-দুপুরে লছমীর মুখে অ্যাসিড ঢেলে দিয়ে গেল সেই নেতার ছেলের অনুচরেরা।

টানা দু-মাস হাসপাতালে কাটিয়ে লছমী ওই চেহারা নিয়ে বাড়ি ফিরল, যে-চেহারা আমরা একটু আগে দেখেছি। হ্যাঁ, সেই নারকেলের মালার মতন মুখ। চুল নেই, ভুরু নেই। আনন্দহীন এক অনিবার্য হাসিতে যে-মুখ সারাক্ষণ ভেসে যাচ্ছে।

'তারপর?,' কোনোরকমে জিজ্ঞেস করল মানিক। 'এখানে এলে কেন?।'

বুধুয়া বলল, 'প্রাণ বাঁচাতে বাবু। এই যে দেখছেন হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছি, এ ওদেরই কল্যাণে। সাবধানেই থাকতাম, তবু একদিন রাতের দিকে একা পেয়ে, পিটিয়ে আমার দুটো পায়ের হাড্ডিই ওরা ভেঙে দিয়ে গেল। যে কদিন হাসপাতালে ছিলাম সেই কদিন ওরা এসে আমার মেয়ের মুখের সামনে আয়না ধরে হাসাহাসি করত। ফিরে এসে দেখলাম, পাগল হওয়ার যেটুকু বাকি ছিল, এই কদিনের মধ্যে লছমী সেটুকু হয়ে গেছে। ও আত্মহত্যা করতে চাইছে।'

'কী করব বুঝতে পারছিলাম না। বস্তিতে থাকলে তো ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। বলা যায় না, আমার মেয়েকেও আবার তুলে নিয়ে যেতে পারে। কে ওদের আটকাবে? আবার নিজের এই শরীর নিয়ে বেশি দূরেও তো যেতে পারব না। তাই ভাবলাম, এখানে এই কাশবনের মধ্যে মেয়েকে নিয়ে লুকিয়ে বসে থাকি। আমার পা-টা একটু সারলে, মেয়ের মনটা একটু ঠিক হলে, তখন না হয় আবার অন্য কোথাও চলে যাওয়ার চেষ্টা করব।'

এই অবধি বলে বুধুয়া মাথা নীচু করে নিজের চিন্তায় ডুবে গেল।

মুখ তুলে ঘরটার দিকে তাকালাম। চাটাইয়ের পর্দার ওপাশে কাউকে দেখতে পেলাম না। বুধুয়াকে প্রশ্ন করলাম, 'তোমাদের খাওয়া-দাওয়া কীভাবে চলছে, বুধুয়া? জল পাচ্ছ?।'

'চিড়ে-গুড় নিয়ে এসেছিলাম, শেষ হতে চলেছে। জল পাচ্ছি বাবু। এই ঘরের পেছনেই বেদেদের একটা ইঁদারা খুঁজে পেয়েছি। জল অনেক নীচে, তবে খাওয়া যায়।'

'চাল-ডাল আনাজ দিয়ে গেলে রান্না করতে পারবে?।'

বুধুয়া ঘাড় নাড়ল। বলল, 'ঘরে আগুন জ্বালাই না বাবু। না হলে পারতাম। মেয়েটা কখন শাড়িতে আগুন ধরিয়ে নেবে ঠিক কী? ওর খুদখুশি আটকানোই এখন আমার সবচেয়ে বড়ো কাজ।'

আমি আর মানিক চুপচাপ ঘরে ফিরে এলাম। এই পাপের শহরে আমরাই বহিরাগত। আমরা কীভাবে ওকে সাহায্য করব? যেটুকু পারি সেটুকুই করলাম। সেদিনই বিকেলে মাসির চোখ এড়িয়ে কিছু শুকনো খাবার, দুটো নতুন শাড়ি, বুধুয়ার জন্যে কিছু জামাকাপড় আর ব্লিচিং-ফিনাইলের মতন কিছু ডিসইনফেকট্যান্ট ওর ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে এলাম।

পৌঁছিয়ে দিতে গিয়ে ওর সঙ্গে আবারও কিছুক্ষণ কথা হল, ওই বাইরে দাঁড়িয়েই। জিজ্ঞেস করেছিলাম, লছমী সুইসাইড করতে চাইছে কেন? বুধুয়া বলেছিল, 'ও ওর পুরোনো মুখটা, আসল মুখটা ফিরে পেতে চাইছে বাবুজি। মাঝেমাঝেই আয়না বার করে মুখ দেখে আর রাগে দেয়ালে মাথা ঠোকে। নিজেকেই নিজে ঘেন্না করতে শুরু করেছে আমার মেয়ে। ওর ধারণা, মরে গেলেই ও আবার আগের শরীর নিয়ে ফিরে আসবে।'

বললাম, 'ওকে একবার ডাকো না। একটু কথা বলি, বোঝাই।'

বুধুয়া বলল, 'পাগল হয়েছেন? আমার সামনেই মুখ থেকে কাপড় সরায় না তো আপনারা। তবে ও আজ একটা কথা বলেছে।' এই বলে বুধুয়া ক্লিষ্টভাবে একটু হাসল।

মানিক বলল, 'কী বলেছে?।'

'বলেছে, বাঙালিবাবুরা খুব ভালো। ও আগের মতন সুন্দর হয়ে গেলেই আপনাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে প্রণাম জানিয়ে আসবে।'

এই লেখার শুরুটার কথা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে পড়ছে। ওই যে, বলেছিলাম, শহরটায় এক-বছরের বেশি থাকতে পারিনি। বলেছিলাম, একটা মেয়ে এখনও তার সমস্ত শোক নিয়ে ওই শহরে লুকিয়ে রয়েছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনারা ভাবতে শুরু করেছেন, কেন? কেন থাকতে পারিনি? কেন লছমী কুড়িবছর বাদেও লুকিয়ে থাকবে? অধৈর্য লাগছে হয়তো আপনাদের। কাজেই দেরি না করে, আর একটামাত্র দিনের কথা বলে এই কাহিনিতে ইতি টানি। আশা করি তার থেকেই আপনাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।

বলছিলাম এক রবিবারের কথা। এও ছিল সেরকমই আর এক রবিবার। মাঝখানে বড়ো জোর একুশটা দিন কেটেছিল। তার মধ্যে সেরকম উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি। মানুষের মন যে-কোনো বিষয়েই খুব তাড়াতাড়ি বীতস্পৃহ হয়ে যায়। প্রেমে, ঘৃণায়, বিস্ময়ে, এমনকি আতঙ্কেও। তাই মাত্র একুশ-দিনেই বুধুয়া আর লছমীকে ছেড়ে আমাদের মন অন্য নানান দিকে ঘুরতে শুরু করেছিল।

লছমীর কান্না তখনও কানে আসত। কখনো-কখনো দেখতেও পেতাম ওকে, যখন ও ওর বীভৎস মুখটা নিয়ে দু-এক মুহূর্তের জন্যে বাইরে এসে দাঁড়াত। কিছু মনে হত না। বুধুয়াকে দেখতাম লুকিয়ে-লুকিয়ে বাড়ির পেছনে ইঁদারার দিকে জল নিতে যাচ্ছে। ওর পা-দুটো বোধহয় একটু সেরেছিল। কুঁজো হয়ে হলেও, ও আবার দু-পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারছিল। আস্তে-আস্তে ওই দেখাটুকুও কমে গেল। তার একটা বড়ো কারণ, মানিকের ঘরের ওই মাঠের দিকের জানলাটা দিয়ে লু-হাওয়া ঢুকতে শুরু করেছিল। তাই ও জানলাটা বেশিরভাগ সময় বন্ধ করে রাখত। আর তা ছাড়া তখন তো জেনে গেছি, ওরা ভূত নয়। মানুষমাত্র। কাজেই কৌতূহলেরও আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না।

এইরকম একটা সময়েই, পোড়ো জমিটার দিক থেকে একটা দুর্গন্ধ ভেসে আসতে শুরু করল। প্রথমে ভেবেছিলাম ইঁদুর মরেছে। গন্ধটা আরও একটু তীব্র হতে ভাবলাম কুকুর। আমরা ছাড়া ওই বেদিয়াটোলিতে তো আর কোনো মানুষ ছিল না। তাই পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে কমপ্লেন জানানোরও কেউ ছিল না। ও হ্যাঁ, বুধুয়া আর তার মেয়ে ছিল ঠিকই, কিন্তু ওরা তো বাইরে বেরোবে না।

তৃতীয় দিন সকালে আর না পেরে আমি আর মানিক নাকে গামছা জড়িয়ে খোঁজ নিতে চললাম। প্রথমেই ঢুকলাম বুধুয়ার ঘরে, ও কিছু জানে কিনা জিজ্ঞেস করতে। ঘরে ঢুকে দেখলাম ঘর খালি। তখন ঘরটার পেছনদিকে ওদের খুঁজতে গেলাম। দেখলাম, মাটির সঙ্গে লাগানো একটা ইঁদারার গা বেয়ে রাশি-রাশি মেঠো ইঁদুর ওঠানামা করছে। ইঁদারার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলাম ওরা দুজনে নীচে পড়ে রয়েছে বুধুয়া আর লছমী। বুধুয়ার শরীরটা লছমীর শরীরটাকে প্রায় ঢেকে রেখেছিল। তার মানে আগে লছমী ঝাঁপ দিয়ে মরেছে আর তারপর সেই দৃশ্য দেখে বুধুয়া।

ভাগ্যিস রবিবার ছিল। জ্যান্ত মানুষকে নিয়ে না ভাবলেও থানা-পুলিশ-পঞ্চায়েত কারওরই দেখলাম মৃত-মানুষদের সম্বন্ধে কর্তব্যবোধের অভাব নেই। তাদের জেরার জবাব দিতে হল আমাকে আর মানিককে। নিজেদের বাঁচিয়ে যতটা যা জানতাম বললাম। থানায়, হাসপাতালে, মর্গে সবজায়গায় আমাদের দুজনকেই যেতে হল, যেহেতু লাশ খুঁজে পাওয়ার অপরাধটা আমরাই করেছিলাম। সব সারা করে ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরলাম। আগে ভালো করে চান করে ঘরে ধূপ জ্বালালাম। মড়া-পচা গন্ধটা তখনও যেন নাকে জড়িয়ে ছিল। তারপর কোনোরকমে দুটি খেয়ে, যে যার ঘরে গিয়ে ঘুমিয়েও পড়লাম।

ভোররাতের দিকে পায়ের পাতায় দুটো ঠান্ডা হাতের স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারি সুন্দরী এক কিশোরী। তার তিলফুলের মতন ছোট্ট নাক, টানা-টানা চোখ। আমার দিকে তাকিয়ে সে যখন ঠোঁট টিপে হাসছিল, তখন ওই চোখদুটোও যেন হাসছিল। আরও দেখলাম, তার জোড়া ভুরু আর চিবুকের ঠিক মাঝখানে একটা তিল। আর-একবার আমার পায়ের পাতায় হাত ছুঁইয়ে লছমী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অ্যাসিড-অ্যাটাকের আগের লছমী। অক্ষত লছমী।

বুঝলাম, আত্মহত্যার পরে ওর স্বপ্ন সফল হয়েছে।

পরের দিন কলকাতায় হেড-অফিসে গিয়ে বললাম, হয় ট্রান্সফার মঞ্জুর করুন, নাহলে রেজিগনেশন-লেটার নিন। আমার সঙ্গে মানিকও গিয়েছিল। লছমী একা আমাকেই তো আর প্রণাম জানিয়ে যায়নি।

ওরা জোকারের শিকার

শিশু কিংবা বালক-বালিকাদের গায়ে আঁচ লাগেনি। যুবক-যুবতি কিংবা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও না। যেহেতু সেই অলৌকিক অস্তিত্ব আঘাত করেছিল শুধু সাতশিমুলী-শহরের অ্যাডোলেসেন্ট ছেলেমেয়েদের, তাই সর্বনাশ যা হবার তা শুধু ওদেরই হয়েছিল। ওই মোটামুটি তেরো থেকে উনিশের মধ্যে বয়স ছিল যাদের।

অমন ছেলেমেয়ের সংখ্যা সাতশিমুলী শহরে তখন খুব বেশি ছিল না। আসলে আমি তো বলছি পঞ্চাশ-বছর আগেকার কথা। সাতশিমুলী শহরটাই তো তখন আজকের চেয়ে অনেক ছোটো ছিল। শহর নয়, বড়োজোর একটা ছোটো গঞ্জ বলা যেত তাকে।

দুটো স্কুল ছিল শহরটায়, একটা ছেলেদের, অন্যটা মেয়েদের। একটা কলেজ ছিল কো-এড। পঞ্চাশ বছর আগে একটা মফসসল শহরে আর যা-যা থাকত তার সবই ছিল। পিচ-রাস্তার পাশাপাশি খোয়া-ফেলা রাস্তা ছিল। রাস্তার ধারে, অনেক দূরে-দূরে, একটা করে টিমটিমে আলোর ল্যাম্পপোস্ট ছিল। টিউবওয়েল ছিল, লাল টালির ছাদওলা পোস্টঅফিস ছিল। আর ছিল নির্জন এক রেলস্টেশন। এইরকম একটা সাদামাঠা শহরে সবমিলিয়ে হাজার দেড়েক লোক বাস করত। তার-মধ্যে দেড়শোজন ছিল 'না-বাচ্চা না-বড়ো' ওই বয়সটায়।

রেললাইনের ধারে একটা মস্ত বড়ো মাঠ ছিল। তার একদিকে ছোটো একটা ঝিল। মাঠটায় নানান বয়সের ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে খেলাধুলো করত। খুব ছোটোরা হাওয়াই চটির গোলপোস্ট বানিয়ে রবারের বল দিয়ে ফুটবল খেলত, কিংবা ইটের উইকেটে ক্রিকেট। বড়োদের জন্যে ছিল বাঁশের গোলপোস্ট। অন্য আর একদিকে বালিকা থেকে কিশোরীরা চুনের দাগ কেটে হাডুডু, ব্যাডমিন্টন এইসব খেলত।

কিংবা খেলতও না অনেকসময়।

কিছু কিছু ছেলে কিংবা কিছু কিছু মেয়ে এক-একদিন দূরের কোনো প্রান্তে চুপ করে বসে থাকত। ওদের বয়স ওই তেরো থেকে উনিশের মধ্যে। হয়তো সেদিনই সেই মেয়ের ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে, কিংবা সেই ছেলের আগের রাতেই কোনো অশ্লীল স্বপ্ন দেখে ঘটেছে বীর্যপাত। তখন নিজেদের শরীরটাকেই ওই ছেলে বা মেয়ের মনে হচ্ছে খুব নোংরা। নিজেকে মনে হচ্ছে পাপী। ওরা কিছুতেই বুঝতে পারে না, কেমন করে ওদের এতদিনের পরিচ্ছন্ন-ছিমছাম শরীরগুলো হঠাৎই এত নেংরা হয়ে যাচ্ছে! কেন ছেলেদের গলার স্বর ভাঙছে! কেন মেয়েদের বুকের সদ্য-ফোটা বাতাসায় এমন বিষপিঁপড়ের কামড়!

ওই বয়সটায় ওরকমই হয়।

আরও নানারকমের সংকট ছিল ওদের। আরও নানান পাপের হাতছানি। কখনও সে-সব জানা যেত; বেশিরভাগ সময়ে জানা যেত না। যেমন বিজন হালদার বলে নিরীহ ধরনের মাঝবয়সি গানের মাস্টার, যে একা পেলেই ছাত্রীদের বুকে বা ঊরুতে হাত বোলাত এ-কথা কে জানত, যদি না একদিন শিপ্রা নামে এক আধপাগলা মেয়ে হালদার স্যারের হাতটাকে দাঁতের মধ্যে কামড়ে ধরে না নিত।

এসব কথা এই-কারণেই বলছি যে, পরে যখন আমরা সাতশিমুলীর অ্যাডোলেসেন্ট ছেলেমেয়েদের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত শুরু করেছিলাম, তখন আমাদের মধ্যেই কেউ-কেউ, যারা বাইরের লোক, তারা শহরটার নিষ্পাপ চেহারা দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের বোঝাতে হয়েছিল, এসবই বাইরের রূপ। আসলে দু-চারজন বিধবা মেয়ে প্রতিবছরই এখানে রেললাইনে গলা দেয়। রেলের স্ক্র্যাপ বিক্রির একটা চক্র সাতশিমুলীতে অনেকদিন ধরেই অ্যাকটিভ। তারই ফলশ্রুতিতে ইটভাটার মাঠে দু-চারটে মরদের লাশও পড়ে ফি-বছরেই।



কিন্তু সেসব খুন কিংবা আত্মহত্যার তালিকায় এতদিন অবধি পূর্ণবয়স্ক মানুষরাই ছিল। স্বাভাবিক। বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েদের ওপর থেকে অভিভাবকদের রাশটা তো আর চলে যায় না। বরং ম্যাট্রিকের মতন পরীক্ষা-টরীক্ষা দিতে হয় বলে বেশ কড়া নজরের মধ্যে থাকতে হয় তাদের অনেককে। তারা কেন আত্মহত্যা করার মতন গভীর দুঃখ পাবে? কেনই বা খুন হবে?

তবু আমরা যারা সাতশিমুলীতেই জন্মেছি এবং বড়ো হয়েছি, পঞ্চাশ বছর আগে আমরা যারা যুবক ছিলাম, তারা স্পষ্ট মনে করতে পারি যে কমবয়সি ছেলেমেয়েগুলোর ওপরে ওই আঘাত নেমে আসার বছরখানেক কিংবা বছর-দেড়েক আগেই সাতশিমুলীতে আরও একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, যার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

সেই ঘটনাটার কথায় আসার আগে সাতশিমুলীর একটা বিশিষ্ট চরিত্রের কথা বলে নিই।

হয়তো এখনকার তুলনায় পঞ্চাশ বছর আগের মফসসলে চিৎকার চ্যাঁচামেচি কম ছিল বলেই ওখানে গুজব ছড়িয়ে পড়ত খুব তাড়াতাড়ি। একজন কেউ ফিশফিশ করে একটা কথা বললে, সেটা চট করে আর পাঁচজনের কানে ঢুকে যেত। পাঁচজনের কাছ থেকে পঁচিশজনের কানে, পঁচিশজন থেকে পাঁচশোজন।

অদ্ভুত অলৌকিক সব গুজব একমাস, দু-মাস ধরে গঞ্জের বাতাসকে কিছুটা ভারী, কিছুটা অসুস্থ করে রাখত। কখনও শোনা যেত মাখলা বস্তির যে বুড়িটা গত শনিবার একাদশীর দুপুরে পুকুরে ডুবে মরল, সেই বুড়িই নাকি রাতে পাড়ার লোকেদের নাম ধরে ডেকে ডেকে ঘুরছে। ঘুমের মধ্যে কেউ সাড়া দিয়েছে কি, তে-রাত্তিরের মধ্যে সে নিজেও মরবে।

কখনও শোনা যেত নদীর ঘাটে ঘুরে বেড়ানো এক অলৌকিক কালো-কুকুরের কথা। সেই কুকুর কোথা থেকে এল, কোথায় সে থাকে কেউ জানে না। শুধু এইটুকু জানা গেছে যে এর মধ্যে যে দুজনের দিকে সেই কুকুর জ্বলন্ত চোখ তুলে তাকিয়ে ছিল, সেই দুজনেই নদীতে চান করতে নেমে আর ওঠেনি।

এইরকমই একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল সেই সন উনিশশো-সত্তরে। রক্তচোষার গুজব। এই গুজবটা শহরের মানুষের মধ্যে বেশি অভিঘাত তৈরি করতে পারেনি, তার কারণ, সেই রক্তচোষার ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল সাতশিমুলীর বেশ্যাপাড়ার মধ্যে।

সুরকিখাল নামে যে সেচ-ক্যানালটা সাতশিমুলীর দক্ষিণ সীমানা ধরে পুব থেকে পশ্চিমে বয়ে গেছে, সেই খালটার ধারেই বেশ অনেকখানি জায়গা নিয়ে খোলা আর টালির চালের ঘরগুলো দাঁড়িয়ে ছিল। এখন আর ওই বেশ্যাপাড়াটা নেই; ওখানে এখন ফ্ল্যাটবাড়ি উঠে গেছে। তবে সেই উনিশশো-সত্তরে কিন্তু হাইওয়ের ট্রাক-ড্রাইভার আর খালাসিদের কল্যাণে ওদের ব্যাবসা বেশ জমজমাট ছিল। শহরের উঠতি ছেলেছোকরা আর প্রৌঢ়রাও যে মাঝেমধ্যে ঘুরে আসত না তা নয়। কিন্তু ঘটনাটার কথা তাদের কারওর মুখ থেকে ছড়ায়নি। তারা কেউ বলবে নাকি, ভাই রে, কাল সুরকিখালের রেডলাইট এরিয়ায় কি সাংঘাতিক জিনিস দেখে এলাম শোন।

না, কথাটা ছড়িয়েছিল সাতশিমুলী থানা থেকে। থানার ও.সি. কয়েকজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে এনকোয়ারি করতে গিয়েছিলেন। সকলেই জানে, ওই কনস্টেবল আর ড্রাইভারগুলো আড্ডা মারার রাজা। ওদের মুখ থেকেই সব কথা ছড়িয়ে পড়েছিল, বেশ ডিটেলে।

গল্পটা এইরকম—

একটি বা দুটি লম্বা ফ্যাকাশেপানা লোককে নাকি কিছুদিন ধরে সুরকিখালের বেশ্যাপাড়ায় কাস্টমারের বেশে ঘুরতে দেখা যাচ্ছিল। যেদিনের কথা বলছি, তার আগের রাতেই তারা ওখানকার পাঁচটা মেয়েকে অজ্ঞান করে, তাদের রক্ত চুরি করে পালিয়েছিল।

ও.সি.সাহেব বস্তির মাঝখানে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে গলা তুলে বললেন, একজন না দুজন? ঠিক করে বলো।

বড়োসাহেবের গায়ের একদম কাছে দাঁড়িয়ে ছিল মহল্লার মুকুটহীন রানি কাবেরীমাসি। সে বলল, স্যার, ম্যাক্সিমাম লোক বলছে একজন। কিন্তু ওই শিবু চা-ওলা আর এতোয়ারিদিদির ভেড়ুয়া কার্তিক বলছে বদমাশগুলো দুজন ছিল। ওরা বিশ্বাসী লোক স্যার। নেশাভাং করে না। তাই বলছি হতেও পারে দুজন।

কার্তিক আর শিবু ভিড়ের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিল। নিজেদের নাম শুনে এগিয়ে এসে বলল, রাত বারোটার পরে ওরা দুজনে নাকি রাতে তিননম্বর গলিতে শিবুর চায়ের দোকানের সামনের বেঞ্চিতে বসে গল্প করছিল। ওই জায়গাটা এমন যে, একসঙ্গে তিনটে প্যারালাল গলির বেশ কিছুটা অংশ দেখা যায়। তখনই ওরা দুটো লোককে একসঙ্গে দেখেছে। হুবহু এক দেখতে লোকদুটোকে। এমনকি পোশাকও এক। যেন জোড়ুয়া ভাই।

বস্তির বাইরে, দিল্লি রোডে উঠবার মুখটায় যে খোঁড়া ভিখিরিটা বসে থাকত, সে ব্যাটা যে কখন ও.সি.র একেবারে পায়ের কাছটায় এসে বসেছিল কেউ খেয়াল করেনি। এইসব শুনে সে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল।

ভিখিরিটা যা বলল, তার সারমর্ম হচ্ছে, কাল ভোর-রাতে, একেবারে একই পোশাকের একই চেহারার পাঁচজন লোককে ও দেখেছে একটা মেয়েকে কাঁধে নিয়ে সুরকিখালের ঢাল বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে।

ও এমনকি এ-কথাও বলল যে, একটাই লোক ভেঙে পাঁচভাগ হয়ে গিয়েছিল। না হলে সাদরঙের মুখ, কুচকুচে কালো জোড়া-ভুরু, কালোর ওপরে সাদা স্ট্রাইপ টানা ভেলভেট-কাপড়ের লংকোট আর প্যান্ট, এসব যদি বা পাঁচজনের ক্ষেত্রেই মিলে যায়, তাদের পাঁচজনেরই নাকের ডগায় টুকটুকে লাল রং মাখানো থাকবে কেন?

কাবেরীমাসি তদ্দণ্ড ল্যাংড়া ভিখিরিটাকে প্রচণ্ড খিস্তি দিয়ে চুপ করিয়ে দিল। ও.সি. সাহেবকে বলল, হারামিটা সারাদিন পাতার নেশা করে স্যার। ওর কথা শুনবেন না। মহল্লার সব মেয়ে যে-যার ঘরে রয়েছে। কেউ কাউকে ধরে নিয়ে যায়নি। শুধু ওই কালো কোট পরা লম্বু লোকটা গতকাল যে পাঁচটা মেয়ের ঘরে বসেছিল, তাদের প্রত্যেকেরই আজ সকাল থেকে মড়ার হাল। বাঞ্চোত আমার মেয়েগুলোকে ড্রাগ খাইয়ে আধমরা করে দিয়ে গেছে।

ও.সি.সাহেবের বয়স অফিসিয়ালি যদিও তখন সাতান্ন চলছিল, তার মধ্যে বছর পাঁচেক হাত্তা মারা ছিল। অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি বাষট্টি। তিনি এই কথা শুনে এজাহার লেখা থামিয়ে অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলেন, এক রাতে পাঁচজনের সঙ্গে সেক্স করা যায়?

কাবেরীমাসির শরীরটা থলথলে হয়ে গেলেও দেখতে তখনও ভারি গর্জিয়াস ছিল। সবুজ শিফন-শাড়ির আঁচল খসিয়ে ও.সি.র কানে কানে মাসি ফিশফিশ করে বলল, ডিউটির বাইরে একদিন আসুন না স্যার। আমার কাছে অরিজিনাল শিলাজিৎ আছে। সারারাত করতে পারবেন।

থামো তুমি! ধমকে উঠলেন ও.সি.সাহেব। মানুষটা সচ্চরিত্র ছিলেন। বললেন, ড্রাগ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে বলছ, কিন্তু তার পেছনে মোটিভটা কী? মানে উদ্দেশ্য কী? কিছু চুরি গেছে?

এবার একসঙ্গে অনেক দালাল, দোকানদার, ছুকরি ও মাসি সমস্বরে বলে উঠল, রক্ত নিয়ে গেছে স্যার। গিয়ে দেখুন ওদের হাল। চামড়া সাদা হয়ে গেছে। ধুঁকছে স্যার মেয়েগুলো। উঠে বসতে পারছে না।

কর্তব্যনিষ্ঠ বড়োবাবু একে-একে পাঁচটা মেয়ের ঘরেই গিয়েছিলেন সেদিন। তিনিই ওদের সাতশিমূলীর হাসপাতালে ভরতির বন্দোবস্তও করেছিলেন। সত্যিই মেয়েগুলোর শরীরে রক্ত ছিল না। তবে তা ছাড়া আর কোনো জিনিস খোয়া যায়নি। আরও অবাক ব্যাপার, বড়োবাবু জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, কারওর সঙ্গেই সেই অজানা দুষ্কৃতী সংগম করেনি।

পরে মেয়েগুলোর জ্ঞান ফেরার পরে ওরা বলেছিল, লম্বু খরিদ্দারটি ঘরে ঢুকে দরজায় খিল লাগিয়ে একবার শুধু ওদের চুমু খেয়েছিল। দীর্ঘ সেই চুম্বনে এমন মাদকতা ছিল যে ওই পাঁচ পোক্ত বেশ্যারও মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তারপর কখন যে রক্ত টেনে নিয়েছিল তা আর ওদের মনে নেই।

হাসপাতালের ইয়ং ডাক্তারবাবুটি ও.সি.সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, এসব গালগল্প শোনেন কেন? রক্ত নিতে গেলে চামড়ার কোথাও তো একটা পাংকচার-মার্ক থাকবে। ওদের শরীরে ওসব কিছুই নেই। আর একটা কথা শুনুন সাহেব। পাঁচটা মেয়েই টিন-এজার। অপুষ্ট শরীরে ওদের অনেক ধকল নিতে হয়। তাই এমনিতেই শরীরে ওদের রক্ত কম, যাকে বলে অ্যানিমিক। তবে হ্যাঁ, লোকটা ওদের জলে বা খাবারে ড্রাগ মিশিয়ে দিয়ে থাকতে পারে। সেইজন্যেই সবকটা ঝিমোচ্ছে। সেটা কোনো পারভারশন থেকেও দিয়ে থাকতে পারে লোকটা। আপনি ওই অ্যাংগেলে কেসটা দেখুন।

তা দেখেছিলেন ও.সি.সাহেব। কিন্তু লোকটাকে ধরতে পারেননি। সে আর দ্বিতীয়বার ওই বেশ্যাপাড়ায় ফিরেও আসেনি।

সেই খোঁড়া ভিখিরিটা দুটো অদ্ভুত কথা বলেছিল।

কাদের বলেছিল?

আমাদের, হ্যাঁ আমাদেরই বলেছিল।

সুরকিখালের ওই ঘটনার প্রায় বছর দেড়েক বাদে, উনিশশো-একাত্তরের জুলাই মাসে আমরা যখন সাতশিমুলীর টিন-এজার ছেলেমেয়েদের মৃত্যুরহস্যের পেছনে দৌড়োচ্ছি, তখন সেই ভিখিরিটি কোথা থেকে যেন খবর পেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। লোকটা চরস খেত ঠিকই। তবু সেদিন যে দুটো কথা ও আমাদের বলেছিল সেগুলোকে উড়িয়ে দিতে পারিনি। কারণ ওর বলার ভঙ্গিতে একটা অদ্ভুত সততা ছিল।

ও বলেছিল, সুরকিখালের বেশ্যাপাড়ার পাঁচটা মেয়েরই ঘরের দেয়াল-আয়নাগুলো উলটে রাখা ছিল এবং ওই পাড়ার একটা মেয়ে সত্যিই মিসিং ছিল। একটা তেরো-চোদ্দো বছরের নেপালি মেয়েকে সবেমাত্র তার আগের মাসেই কাবেরীমাসি নাকি সতেরো হাজার টাকা দিয়ে বীরগঞ্জ থেকে কিনে এনেছিল। সেই মেয়েটাকেই কাবেরীর ঘর থেকে সবার অজান্তে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ওই পাঁচটা লোক। কিংবা পাঁচভাগে ভেঙে যাওয়া একটা লোক।

আমরা জিজ্ঞেস করিনি, পুলিশের কাছে কাবেরীমাসি কথাটা লুকিয়ে গিয়েছিল কেন! একজন আন্ডার-এজেড মেয়েকে জোর করে গণিকাবৃত্তিতে নামানোর শাস্তি যে কী হতে পারে তা আমরা জানতাম।

আয়না উলটে রাখার মানে কী হতে পারে সেটা অবশ্য ওকে আমরা জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ আমরা ও-ব্যাপারে কিছুই জানতাম না।

লোকটা অবাক হয়ে আমাদের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিল, আপনারা জানেন না, রক্তচোষারা যে-দুটো জিনিস সহ্য করতে পারে না তার একটা হল আয়না! আর অন্যটা হল রসুন। এই বলে সে নিজের নোংরা শার্টের নীচ থেকে একটা রসুনের কোয়া দিয়ে গাঁথা মালা একপলকের জন্যে বার করে আমাদের দেখিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

যাবার আগে বলে গিয়েছিল, আমি ওকে চিনে ফেলেছি স্যার। এমনিতে বুঝতেই পারছেন নিশ্চয়ই, টিন-এজেড ছেলেমেয়েরাই ওর পছন্দের জিনিস। তবে এই মালাটা গলায় না থাকলে এতদিনে আমাকেও ভোগে পাঠিয়ে দিত। যাই হোক, দরকার হলে আমাকে ডাকবেন। আমি এখনও ওই দিল্লি রোডের ক্রসিং-এ বসেই ভিক্ষে করি।

সুরকিখালের দীর্ঘদেহী রক্তচোষার ঘটনাটা সাতশিমুলীর মূল শহরের মধ্যে খুব বেশি পেনিট্রেট করতে পারেনি; রেড-লাইট এরিয়ায় জন্ম নিয়ে রেড-লাইট এরিয়াতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবার যে-কথাটা বলতে চলেছি, সেটা অন্তত তিন-মাস ধরে একদম মূল শহরের তেরো থেকে উনিশ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে চক্কর কেটেছিল। তবুও সিক্রেট-টা যে কেমন করে শুধু ওই টিন-এজারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তার বাইরের কোনো এজ-গ্রুপে ফাঁস হয়নি, সেটা বেশ বিস্ময়কর। বাচ্চাগুলো যা জানল, সেগুলো কোনোভাবেই তাদের বাবা-মা, দাদা-দিদি কিংবা টিচারদের মধ্যে কেউ জানল না কেন? এতটা মন্ত্রগুপ্তি ওরা কেমন করে বজায় রেখেছিল?

অবশ্য পরে সব কথা শোনার পরে (এবং কয়েকটা জিনিস দেখার পরে) আমাদের দুটো কথা মনে হয়ছিল। এক, কালো-কুকুর বা বুড়ির নিশিডাকের মতন অলৌকিক শুনতে হলেও, এদের মৃত্যুর পেছনের গল্পটা মোটেই ওগুলোর মতন আজগুবি নয়। একটা ভয়ংকর সত্য, যাকে বলে 'ফ্যাক্ট' লুকিয়ে ছিল কথাটার পেছনে। আর দুই, ঘটনাটার মধ্যে চূড়ান্ত অশ্লীলতার একটা অ্যাংগেল ছিল, যেটা বাচ্চাগুলোও জানত। আর সেটা জানত বলেই ওরা বন্ধুবান্ধব ছাড়া অন্য সকলের কাছে অমন ঠোঁট টিপে রেখেছিল।

দেড়শোজনের মধ্যে যে ছজন বাচ্চা মারা যাওয়ার আগে আমাদের কিছু বলে যেতে পেরেছিল, তারা সকলেই একটা সুরের কথা বলেছিল আর গান শোনার যন্ত্রের কথা বলেছিল।

সুর মানে সংগীত, গান। সুর মানে মায়াজাল। সেই সূত্রেই কিছু প্রাসঙ্গিক-কথা বলি। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, আমরা পঞ্চাশ বছর আগের এক কালখণ্ডে শতাধিক অ্যাডোলেসেন্ট ছেলেমেয়ের একইসময়ে

অদ্ভুত মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করছি। তাই সেই-সময়ের সুরের দুনিয়াটার কথা একবার আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই।

ভেবে দেখুন, তখন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কোনো মফস্‌সল শহরে কেউ স্বপ্নেও স্মার্টফোন আর ইউ-টিউবের কথা ভাবতে পারত না। ওয়াকম্যান আর ক্যাসেট প্লেয়ার আসতেও তখনও ঢের দেরি ছিল।

গান শোনার জন্যে তখনও মানুষের একমাত্র অবলম্বন ছিল রেডিয়ো আর পয়সাওলা লোকেদের বাড়িতে রেকর্ড-প্লেয়ার। তা, ওরকম পয়সাওলা লোক সাতশিমুলীতে ছিল না। তাই রেডিয়োর 'মন চাহে গীত', 'বিনাকা গীতমালা', 'অনুরোধের আসর' এইসব প্রোগ্রাম সকলের মধ্যেই ছিল বিপুল জনপ্রিয়।

তবে ওই সময়েই বাজারে ট্রানজিস্টর-রেডিয়ো হঠাৎই খুব সুলভ হয়ে গিয়েছিল। হাসি, মিতালি, বুলবুলি, অভি, টিঙ্কু, সুদীপ ওদের সবারই হাতের নাগালের মধ্যে একটা করে অমন সস্তার রেডিয়ো ছিল, যাতে ওরা নানারকমের প্রচুর গান শুনত। এখনকার মতন এতরকমের এনটারটেইনমেন্ট তো ছিল না। তাই ওরা গানই শুনত। হ্যাঁ, ওই সস্তার রেডিয়োতেই।

রেডিয়ো যেমনই হোক, তার মধ্যে থেকে বেজে ওঠা স্বর্ণযুগের গানগুলোকে ওদের মনে হত স্বর্গীয়। যে-কথাগুলো ওদের বলতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ওরা বলতে পারে না, সেই কথাগুলোই গায়কেরা যেন ওদের হয়ে বলে দেন। ওদের চাপা রাগ, দুঃখ আর অভিমান থেকেই যেন সুর তুলে নেন গীতিকারেরা।

এবার বলি কেমন করে অশ্লীলতা আর সুর একসূত্রে গাঁথা হয়েছিল।

যে-সুরটা ওদের কাছে চেনা-শহরটাকে বদলে দিচ্ছিল, তার সঙ্গে ওদের চেনা কোনো গানের মিল ছিল না। এমনকি ওরা যেটা শুনেছিল, সেটা প্রকৃত-অর্থে গানই ছিল কিনা, তাও ওরা ঠিক করে বলতে পারেনি। ওদের মধ্যে অন্তত দুজন, শান্তা আর বিশু বলেছিল, ওরা যেটা শুনেছিল সেটা একজনের আকুতি মাখানো গলা।

একজনের মানে?

শান্তা বলেছিল, একজন পুরুষের গলা। পুরুষ মানে ইয়ং-ম্যান। গলাটা খুব সুন্দর। শুনলেই মনে হয় তার ফরসা বুকের পাটা তামাটে লোমে ঢাকা।

বিশু বলেছিল, একজন নারীর গলা; সম্ভবত এক কিশোরীর। সবেদার ক্ষীরের মতন মিষ্টি, কিন্তু আঁশ-আঁশ সেই গলার স্বর।

যাই হোক, এর পর যখন ওদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কী শুনেছিলে? কী বলেছিল সেই নারী কিংবা পুরুষকণ্ঠ? তখন ওরা হাসপাতালের বেডে শুয়ে-শুয়েই কিছু ভাঙা ভাঙা বাক্য আমাদের বলেছিল। শুধু শান্তা আর বিশুই নয়, আরও যে চারটে বাচ্চা ওই গণহত্যার দুদিন পরেও জীবিত ছিল, তারাও এক-দুটো কথা বলতে পেরেছিল। আর সবার ওপরে ছিল সেই খোঁড়া ভিখিরি। ও মনে হয় পুরো ঘটনাটার ওপরে ওয়াচ রেখেছিল। অনেক ব্যাখ্যা ওর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম আমরা। এদের সবার কথা মিলিয়ে একটা গল্প তৈরি করেছি। যেহেতু আমাদের হাতে বিশেষ কোনো প্রমাণ নেই, এখনও নেই, পঞ্চাশ-বছর আগেও ছিল না, তাই এগুলোকে আপনারা গল্প হিসেবেই ধরতে পারেন। আবার চাইলে সত্যি বলেও মানতে পারেন।

কথাটা প্রথমে অভি বলেছিল টিঙ্কুকে। বলেছিল, ও একটা লোকের খোঁজ পেয়েছে, যে নাকি আশ্চর্য এক গান শোনার যন্ত্র গিফট করে।

তখন ওদের আশেপাশে আর কেউ ছিল না। শুধু ওরা দুজনেই সেই গ্রীষ্মের বিকেলে মুন্সিপাড়ার গলি ধরে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল।

অভির কথা শুনে টিঙ্কু কেমন যেন চমক খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, লোকটার সঙ্গে তোর কোথায় দেখা হয়েছিল? ও কিন্তু একবারও জিজ্ঞেস করল না, যন্ত্রটা কেমন? শুধু লোকটাকে কোথায় দেখেছিল সেটাই জানতে চাইল।

অভি উত্তর দিল, ইটখোলার রাস্তায়। গর্মেন্ট-কলোনিটা পার হয়ে।

মিথ্যে কথা বলিস না। ওকে আমিও চিনি। ও থাকে ছাপাখানার পাশের গলিতে। আমাকেও মেশিনটা দেখিয়েছে।

অভির পনেরো-বছরের রোগা-শরীরটা সঙ্গে সঙ্গে রাগে শক্ত হয়ে গেল। বলল, মিথ্যে কথা বলব কেন? তাহলে তো তোর সামনে কথাটা তুলতামই না।

অভির যুক্তি ঠিক। টিঙ্কু নরম কেটে বলল, রাগ করিস না ইয়ার। বিশ্বাস কর, আমাকে লোকটা ছাপাখানার পাশের গলিতেই ধরেছিল। আচ্ছা, মেশিনটা দেখতে কেমন ছিল বল তো! কালো প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি দেশলাই-বাক্সের মতন? দুদিক থেকে দুটো তার বেরিয়ে ছিল?

অভি বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। তুই তো দেখেছিস তাহলে। ওই তারের ডগায় দুটো স্পঞ্জের গুটির মতন জিনিস ছিল, তাইতো? ওই গুটিদুটো দু-কানে গুঁজে দিয়ে গান শুনতে হয়।

দেখুন, আপনারা যারা ছোটোবেলায় ওয়াকম্যান ব্যবহার করেছেন এবং এখন হামেশাই স্মার্টফোন থেকে হেডফোনের তার টেনে কানে গুঁজে রাখেন, তাদের কাছে এই আইডিয়াটা ডালভাত। কিন্তু আবারও বলছি, পঞ্চাশ বছর আগে এরকম কোনো জিনিস সাধারণ-মানুষের কল্পনাতেও ছিল না। তবু দেখুন অভি আর টিঙ্কু যে-জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করছিল, তার সঙ্গে এরকম ছোটোখাটো পোর্টেবল সাউন্ড-সিস্টেমের সাংঘাতিক মিল আছে না?

যাই হোক। গানের কথায় কিন্তু টিঙ্কুর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ও অভির কথার উত্তর না দিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল।

অভি কিন্তু ছাড়ল না। ও পেছন থেকে টিঙ্কুর স্কুল-ইউনিফর্মের কাঁধের কাছটা খামচে ধরে ওকে দাঁড় করাল। বলল, শোন। আমার কাছে লুকোনোর দরকার নেই। গান আমিও শুনিনি, তুইও শুনিসনি। আমি কী শুনেছি বলব?

অভির কথায় টিঙ্কুর মুখের ভাবটা একটু সহজ হয়ে এল। ও কাঁধের কাপড়ের ব্যাগটা কাঁধ থেকে কোলের ওপরে নিয়ে, মুনশিবাড়ির রোয়াকে বসে পড়ল। পাশে বসে অভি ফিশফিশ করে বলল, মহামায়া হাইস্কুলের ক্লাস-নাইনের ফার্স্টগার্ল কেয়া মিত্রকে চিনিস? আমি ওই মেশিনের মধ্যে থেকে কেয়ার গলা শুনেছি। পরপর কয়েকটা রাতে নাইটফলের সময় কেয়াকে স্বপ্নে দেখেছিলাম। কিন্তু এই মেশিনের মধ্যে কেয়া যেসব কথা বলছিল, তা আমার স্বপ্নের চেয়েও ল্যাংটা। আমি কল্পনাও করতে পারি না এমন সব গরম-গরম কথা বলে যাচ্ছিল কেয়া। লোকটা শালা পুরোটা শুনতে দিল না, এই যা দুঃখ। এবার বল, তুই কী শুনেছিলিস?

টিঙ্কু বলল, প্রায় সেম জিনিস। আমার স্বপ্ন যাকে নিয়ে, তার কথাই তার নিজের গলায় শুনেছি। আমাদের ছাদ থেকে বউটার চান দেখা যায়। বিহারি বউ। সবাই ঋতুর মা বলে ডাকে। আশ্চর্য কী জানিস অভি, ঋতুর মাকে কোনোদিন হিন্দি ছাড়া অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে শুনিনি। অথচ ওই মেশিনটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু ও বাংলায় কথা বলছিল। অথচ নিজের শরীরের যা ডিটেইলস দিচ্ছিল, তা ঋতুর বাপ ছাড়া আর কারুর পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

কতক্ষণ শুনেছিলিস? অভি জিজ্ঞেস করল।

ধুস! কোথায় আর শুনলাম? দু-মিনিটের মধ্যেই লোকটা কান থেকে খুলে নিয়ে নিল তো!

আবার দেবে বলেছে?

বলেছে। তবে কন্ডিশন আছে। আমি সিওর তোকেও একই কন্ডিশন দিয়েছে। আমাদের মতন কিংবা আর একটু ছোটো দুটো মেয়েকে নিয়ে আসতে হবে, তাইতো?

একদম তাই। কী করবি তুই টিঙ্কু?

আমি? আমি আজ জয়দেববাবুর কোচিং-এ অস্মিতাকে বলব।

অভি এত জোর চমকে উঠল যে, ওর কোল থেকে স্কুলব্যাগটা রাস্তায় পড়ে গেল। সেটাকে তাড়াহুড়ো করে তুলে নিয়ে বলল, তুই তুই ওইসব নোংরা কথা বলবি অস্মিতাকে? ওই মেয়েটার লাভার কে জানিস? পন্টাদা। জানতে পারলে কেলিয়ে তোর গাঁড় ভেঙে দেবে।

আরে, ধুর বাল! টিঙ্কু মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল। বলল, নোংরা কথা বলব কেন? বলব মডার্ন গান-শোনার মেশিনের খোঁজ পেয়েছি, বিনা পয়সায় দিচ্ছে। নিবি তো চল। অস্মিতা গান-পাগল মেয়ে। এই লোভ ও সামলাতে পারবে না, আই অ্যাম সিওর।

তারপর? যখন কানে লাগিয়ে ওইসব শুনবে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তুলবে না?

সে দায়িত্ব আমার নাকি? যে শোনাবে তার। তবে আমার কী মনে হয় জানিস? রোয়াক থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়াল টিঙ্কু।

আমার মনে হয়, নোংরা কথা শোনালেও অস্মিতা রাগবে না। শুনবে। দু-মিনিট শুনবে। তারপর লোকটা ওর কান থেকে যন্ত্রটা খুলে নেবে। তার পরেও অস্মিতা নেশার মতন ওই কথাগুলো শুনতে চাইবে। পন্টাদার গলায় নয়, ও শুনতে চাইবে অন্য কোনো ছেলের গলায়। হয়তো তোর কিংবা আমার গলায়। তখন ও লোকটার কন্ডিশনে রাজি হয়ে যাবে। ও আমাদের বয়সি একটা ছেলেকে লোকটার কাছে ধরে নিয়ে যাবে এবং তার বদলে পার্মানেন্টলি ওই গান-শোনার মেশিনটা হাতে পেয়ে যাবে।

আমরা সাতশিমুলীর তিন-জায়গায় অজ্ঞাতপরিচয় কিছু পুরুষের বসবাসের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছিলাম। পরিত্যক্ত ইটভাটার একটা আধপোড়া ইটের পাঁজার মধ্যে, সরকারি-ছাপাখানার তালাবন্ধ ঘরে(সেটার পেছনের একটা জানলা কীভাবে যেন খুলে গিয়েছিল) আর চিন্ময়ী শ্মশানের কাঠ রাখার পুরোনো-চালাটার নীচে। সামনের দিকে শ্মশানের পাকা বাড়ি তৈরি হয়ে যাবার পর থেকে পেছনের ওই চালাঘরটার দিকে ডোমেরাও যেত না।

আচ্ছা, এই যে বললাম, অজ্ঞাতপরিচয় কিছু মানুষের চিহ্ন, তা কী দেখে বুঝলাম ওরা মানুষ? অন্য কোনো প্রাণী নয়?

এ-কথা ঠিক, তিন জায়গাতেই মানুষের পরিধেয় কিছু পোশাক-আশাক খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ওইটুকুই। কোথাও বসবাস করতে গেলে কি শুধু পোশাকটুকুই জরুরি? রান্না-খাওয়ার চিহ্ন থাকবে না? পানীয় জল, লাগবে না? ছাপাখানার বন্ধ ঘরটায় শৌচাগার অবধি ছিল না।

তিন-জায়গাতেই আমরা কিছু প্রত্যক্ষদর্শীকে পেয়েছিলাম, যারা দূর থেকে লোকগুলোকে দেখেছিল। প্রত্যেকেই ওদের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছিল। ওই বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা আমরা আগেও শুনেছি, খোঁড়া ভিখিরির মুখে। সেই অস্বাভাবিক দীর্ঘতা, ফ্যাকাশে মুখ, কুচকুচে কালো জোড়া-ভুরু আর টুকটুকে লাল নাক।

ঠিক যে-তিনটে স্পটে লোকগুলো বাচ্চাদের হাতে গান-শুনবার যন্ত্রগুলো তুলে দিয়েছিল, তার কাছাকাছিই ওই খালি ডেরাগুলো আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম। হয়তো আর অনেক জায়গাতেই ওরা ছড়িয়ে পড়েছিল। হয়তো সেইসব জায়গাতেও ওরা সাতশিমুলীর বয়ঃসন্ধির বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের কাছে সেক্স-চ্যাট বিক্রি করেছিল যদিও পৃথিবীতে সেক্স-চ্যাট ছড়িয়ে পড়তে তখনও অন্তত চল্লিশ-বছর দেরি ছিল। কিন্তু সেইসব স্পটের হদিস আমরা জানব কেমন করে? প্রায় দেড়শো বাচ্চার মধ্যে তখন বেঁচে ছিল তো মাত্র ছ'জন।

বাকি সবাই তো তার এক দু-দিন আগেই মারা গেছে।

খুব যন্ত্রণা পেয়ে মরেছিল বাচ্চাগুলো। শরীরে রক্ত না থাকার কষ্ট তো ছিলই। তার চেয়েও বেশি কষ্ট পেয়েছিল ওরা স্মৃতিলোপের কারণে। আমরা যারা সাতশিমুলী জেনারেল হাসপাতালে ওদের বেডের পাশে সেইসময়ে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, কোনো এক রিমোট কন্ট্রোলে

ওদের মাথার ভেতর থেকে কেউ বা কারা ওদের স্মৃতি মুছে দিচ্ছে। মায়ের মুখ থেকে হঠাৎই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল অস্মিতা। বাবার হাতের মুঠোটা ঠেলে ছাড়িয়ে নিয়েছিল অভি।

পুরোপুরি স্মৃতিলোপের আগে অভি, টিঙ্কু, অস্মিতা ওরা ছ'জন যেটুকু আমাদের বলে যেতে পেরেছিল, তার থেকেই আমরা এই কাহিনিটা গড়ে তুললাম। তা ছাড়া কিছু বস্তুগত প্রমাণও ছিল। যাকে বলে মেটিরিয়াল- এভিডেন্স।

যে তিনটে ডেরা আমরা দেখেছিলাম, তার প্রতিটিতেই কালো দেশলাইয়ের খাপের মতন বহু কৌটো পেয়েছিলাম। ফরেনসিক-টেস্টে জানা গিয়েছিল, কৌটোগুলো আমাদের অজানা কোনো ধাতু দিয়ে তৈরি। বাক্সগুলোর দুদিকে যা লাগানো ছিল, বাচ্চাগুলো যতই বলুক সেগুলো কোনো অডিয়ো-ডিভাইসের কর্ড, আমরা কিন্তু দেখেছিলাম সিম্পল দুটো করে নল... পাইপ। ফাঁপা এবং ফাঁকা।

তাহলে প্রশ্ন জাগে, খালি-বাক্সের মধ্যে অশ্লীল কথা কোথা থেকে ভেসে এসেছিল?

খোঁড়া ভিখিরিটা কে তা জানি না। তবে লোকটাকে ততদিনে আমাদের ভিক্ষুকের চেয়েও বেশি মনে হচ্ছিল আত্মহত্যাপ্রবণ এক কবি। এরকম হয় অনেক সময়। এই পৃথিবীকে সহ্য করতে না পেরেই কেউ-কেউ নেশায় ডুবে যায়। তার মানে এই নয় যে তারা এই পৃথিবীর পক্ষে অনুপযুক্ত। আসলে পৃথিবীটাই হয়তো তাদের মাপের চেয়ে ছোটো। ভিখিরিটাকে আমাদের মনে হত ওরকম কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি, যে একইসঙ্গে কবির মতন কল্পনাপ্রবণ এবং শিকারির মতন সতর্ক। সে আমাদের বলেছিল, কথাগুলো এসেছিল নাকি বাচ্চাগুলোর নিজেদের মনের ভেতর থেকে। বাক্সের মালিক সেই আশ্চর্য অমানুষ কিংবা ওর কথায় রক্তচোষা নাকি মানুষের মনকে খেলনার মতন দুমড়ে-মুচড়ে, তাকে দিয়ে যা-খুশি-তাই করাতে পারত। তারাই বাচ্চাগুলোকে ওই ফাঁকা বাক্সের মধ্যে দিয়ে নিজেদের অবদমিত-কামের কণ্ঠস্বর শুনিয়েছিল।

আমরা দেখেছিলাম, প্রতিটি কৌটো এবং তার সঙ্গে লাগানো দুটো করে নল একসময় রক্তে ভরতি ছিল। শুকিয়ে যাওয়া রক্তের স্যাম্পেল টেস্ট করে বোঝা গিয়েছিল, সবই মানুষের রক্ত। আরও স্পেসিফিকালি বলতে গেলে, আমাদের ওই ছেলেমেয়েগুলোর রক্ত।

তার মানে ভিক্ষুক-বর্ণিত সেই রক্তচোষা পান করার মতন যথেষ্ট পরিমাণে রক্তের খোঁজে সাতশিমুলীতে এসেছিল এবং সেই রক্ত পেয়েও গিয়েছিল।

খেয়াল করে দেখুন, এবার কিন্তু আমরা একবচন ব্যবহার করছি। বহুবচন নয়। অর্থাৎ ভিক্ষুকের কথাই মেনে নিয়েছি। একজনই ছিল রক্তচোষা। সেই ভেঙে বহু হয়ে যাচ্ছিল।

এই যে মেনে নিলাম, তার পেছনে কারণ আছে। সেখানেই এই কাহিনির শেষ। আপনারা আর একটু ধৈর্য ধরে শুনুন।

বাচ্চাগুলো সবাই যখন মরে গেল, সাতশিমুলীর শ্মশানে যখন টানা তিনদিন ধরে চিতা জ্বলে নিভে গেল, কবরখানার খনক যখন হাতের কোদাল ছুড়ে ফেলে দিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল, তখন সেই ভিক্ষুক আমাদের ইশারা করল ওর সঙ্গে যাবার জন্যে।

যাবার পথে সে সাতশিমুলীর সান্ধ্য-বাজার থেকে অনেক রসুন কিনে নিয়েছিল। আর নিয়েছিল কিছু ফেলে দেওয়া চটের সুতো। চলতে চলতেই সে খুব দ্রুত একটা করে রসুনের মালা গেঁথে আমাদের তিনজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, পরে ফেলুন।

আমাদের অবিশ্বাসের ভিত তখন নড়ে গেছে। আমরা মালাগুলো পরে ফেললাম। ও বলল, মন খারাপ করবেন না। যবে থেকে পৃথিবীতে জীবিত মানুষ রয়েছে তবে থেকেই মৃত মানুষও রয়েছে। আর জীবিত আর মৃতদের সঙ্গেই রয়েছে 'undead'। শরীরের মৃত্যুর পরেও যারা মরে না। সাতশিমুলীর আনডেডটি...

আমরা ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, একজন?

ও বলল, আমি তো প্রথম থেকেই বলছি, একজন। ওকে আমি চিনি। আপনারাও চেনেন। ও হচ্ছে সার্কাসের সেই লম্বা জোকারটা। ভেবে দেখুন। চুনকাম করা মুখ, নাকের ডগায় লাল রং। কালো স্ট্রাইপড

কোট আর প্যান্ট। এরিনার মধ্যে অশ্লীল সব রসিকতা করে বেড়াত। মনে পড়ছে?

আমরা বললাম, পড়ছে।

তাহলে এবার আপনারাই বলুন, ওকে কোথায় পাবেন?

কোথায়?

যেখানে বেঁটে জোকারেরা রয়েছে। বেঁটে এবং অশ্লীল এবং আমুদে। মানে...

আমরা একসঙ্গে বলে উঠলাম টিন-এজার!

একদম ঠিক।

কিন্তু সাতশিমুলীতে কি আর টিন-এজার অবশিষ্ট আছে? সব তো শেষ হয়ে গেল।

ভিখিরিটা আমাদের কথার উত্তর না দিয়ে একটুকরো রাংতার ওপরে চরসের গুলি পুড়িয়ে ছাইটাকে সিগারেটের তামাকের সঙ্গে যত্ন করে মেশাল। তারপর ওখানে বসেই উদাস মুখে ধোঁয়া টানতে-টানতে বলল, আপনাদের কথাবার্তাগুলো খুবই শিশুসুলভ। চলুন।

এই বলে ওর খোঁড়া পায়ের তুলনায় বেশ দ্রুতই হেঁটে একটা গলিপথের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমার জন্ম সাতশিমুলীতে। তবু ওই সরু-গলিটা আমিও ঠিক চিনতে পারছিলাম না।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটলাম আমরা। ততক্ষণে রাত নটা বেজে গেছে। হঠাৎই গলির একপাশে একটা একতলা বাড়ির জানলা দিয়ে গানের সুর ভেসে এল 'হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ডিয়ার মাম্পি। হ্যাপি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ।'

আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম খোলা জানলা দিয়ে খুবই পরিচিত একটা দৃশ্যের টুকরো-টাকরা দেখা যাচ্ছে। সেই রাংতার তারা, বেলুন আর কাগজের রঙিন শিকলি। টেবিলে কেক কাটছে একটা মেয়ে। তাকে ঘিরে তার বন্ধুবান্ধবেরা।

ভিখিরি আমাদের বলল, কেকের ওপরে মোমবাতিদুটো খেয়াল করুন। ওয়ান অ্যান্ড থ্রি, দ্যাট মেকস থার্টিন। তেরো। এক টিন-এজার গেলে আর এক টিন-এজার আসবে, স্যার। দেড়শো টিন এজার গেলে দেড়শো টিন-এজার আসবে। এইটা ভুলে গেছিলেন বলেই আপনাদের বলেছিলাম শিশুসুলভ।

তার সঙ্গেই আসবে আনডেড, তার অবদমিত কামনার পশরা সাজিয়ে। যাই হোক, আবার রাত দুটোর সময় এখানে চলে আসুন। আমি থাকব। আজকেই জোকারকে শেষ করে যাব।

আমরা গিয়েছিলাম ঠিকই, তবে সেই গলিপথ খুঁজে পেতে একটু সময় লেগেছিল বলে ওখানে পৌঁছোতেও একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। অত রাতে নেড়িকুকুরগুলোও বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। একটা ল্যাম্পপোস্টের ম্লান আলো ছাড়া আর কোথাও আলো ছিল না। ওখানেই, মাম্পি নামের সেই বার্থ-ডে গার্লের বাড়ির দরজার বাইরে ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে উবু হয়ে বসে ছিল খোঁড়া ভিখিরিটা। আমাদের দেখে মুখ তুলে তাকাল। তারপর দুদিকে ঘাড়টা নাড়ল।

আমরা বললাম, কী হল?

পারলাম না। ও বলল। এতক্ষণে খেয়াল করলাম, ওর দুহাতের মুঠোয় একটা কাঠের শাবল জাতীয় জিনিস শক্ত করে ধরা। তার ছুঁচলো মুখে টাটকা রক্তের দাগ।

পারলাম না। ও আবার বলল। শরীরটাকে মেরে দিলাম। শরীর মানে তো কবেকার একটা মৃতদেহ। ওই দেখুন, ওইখানে পড়ে আছে। কয়েকটা হাড় আর চামড়া।

চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। দেখলাম সত্যিই কিছুটা দূরে অনেক হাড়গোড়, কালো জামা-প্যান্ট এইসব পড়ে আছে। একটা মাথার খুলি নর্দমার ঢালে গড়িয়ে গিয়েছিল।

ভিখিরিটা আবার বলল, শরীরটাকে মারলাম, কিন্তু সুরটাকে মারতে পারলাম না। ওই যে, শুনুন।

আমরা শুনলাম। খুব ইতর, অশ্লীল একটা শিসের আওয়াজ মাম্পিদের বাড়ির পেছনের দিক থেকে ভেসে এল। দেখলাম, খুব সাবধানে বাড়ির পেছনের দরজা খুলে মাম্পি নামে মেয়েটা উঠোনে বেরিয়ে এল। ওর

চোখদুটো অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছিল আর পাতলা রাতপোশাক ভেদ করে জেগে উঠেছিল দুটি স্তন, যা শিশুরও নয়, যুবতিরও নয়। বয়ঃসন্ধির।

মাম্পির উদগ্রীব স্তন ও ঊরুসন্ধি ওই অশ্লীল সুরের দিকে ছুটে যেতে চাইছিল।

* * *

মাংস-লতার কৃষ্ণকলি

সোমক বুঝতে পারছিল, জনার্দন বোস নামে এই ভদ্রলোক তাকে যতটা খাতির দেখানো সম্ভব দেখাচ্ছেন। মার্কারিড গ্রহের পারদের খনির সুপারভাইজার জনার্দন বোস। ভদ্রলোক বয়সে নিশ্চয়ই সোমকের থেকে বড়োই হবেন। কুড়িবছর এই গ্রহে রয়েছেন বললেন; তার মানে অন্তত পঞ্চাশ বছর বয়স হবে। সোমকের চল্লিশ। চাকরির স্ট্যাটাসে যে সোমক ওঁর থেকে খুব উঁচুতে, তাও নয়। গ্যালাকটিক ট্রেড অর্গানাইজেশনের ইনভেস্টিগেটরের পদটাই ভারিক্কি, আসলে তো ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার। অন্যদিকে একজন মাইনিং-কলোনির সুপারভাইজারের ক্ষমতা অনেক।

তবু সোমক সামনে এলেই উনি ঝুঁকে পড়ছেন, হাত কচলে কথা বলছেন। হয়তো ওঁর মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ কাজ করছে বলেই এরকম করছেন। উনি যদি এই ভদ্রতাটুকু না দেখাতেন, তাহলেও কিছু বলার ছিল না। সৌর-জগতের বাইরের এই মাইনিং-কলোনিগুলোতে কেউ সৌজন্য আশা করে না। পরিবেশের দিক দিয়ে এই জায়গাগুলো নরক এবং এইসব নরকে যারা খনি-মজুরের কাজ করতে আসে, তারা বছর-দুয়েকের মধ্যে ওসব ব্যবহারের লাবণ্য-টাবণ্য হারিয়ে ফেলে। রুক্ষ হয়ে যায়, অশ্লীল হয়ে যায়।

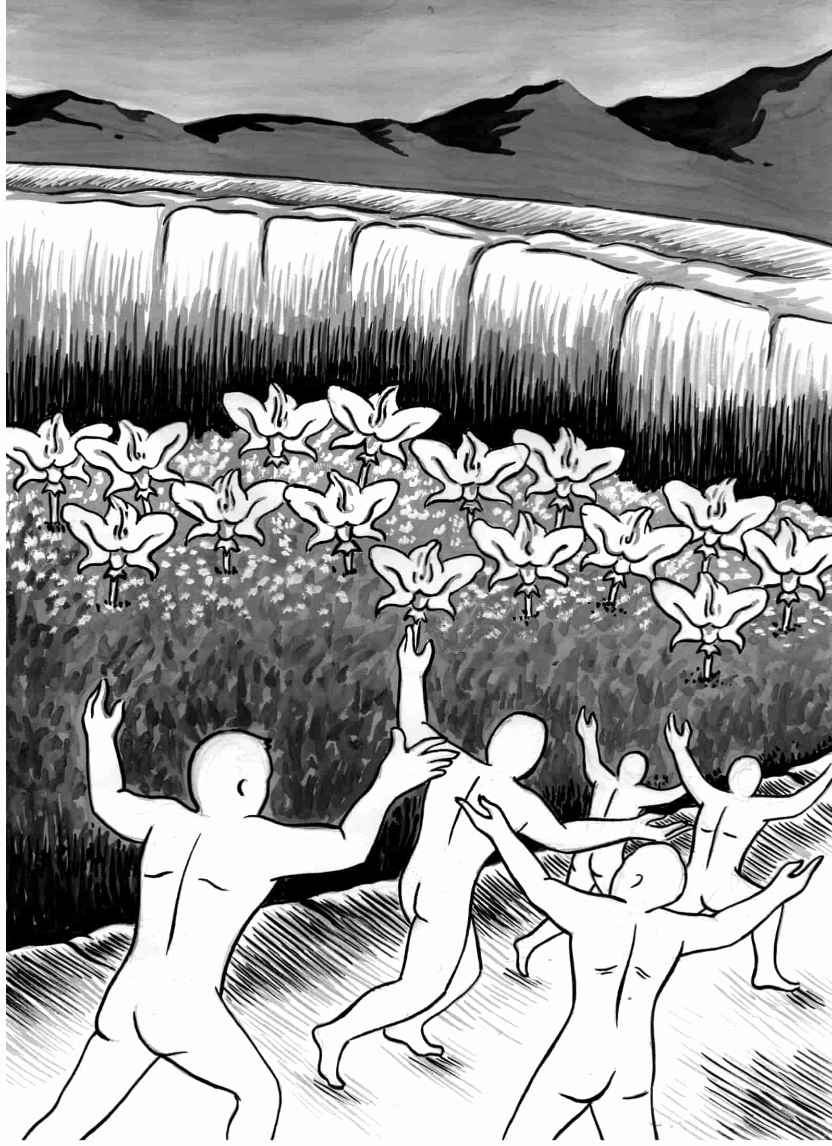
তাঁর পনেরো-বছরের চাকরি-জীবনে কম করে ত্রিশটা এইধরনের মাইনিং-কলোনিতে গিয়েছে সোমক লাহিড়ি। কোনোটায় একাধিকবারও যেতে হয়েছে। প্রথমদিকে প্রতিটি জায়গাতেই অভাবিত আক্রমণের মুখে পড়েছে সে। কিছুই না, হয়তো অন্যমনস্কতার ভান করে পরিষ্কার জামায় খইনির থুতু ছিটিয়ে দিল, পেছন থেকে একটা খিস্তি দিল, কিংবা এনকোয়ারির সময়ে মদে চুর হয়ে এসে, থুম মেরে বসে রইল; কোনো প্রশ্নের জবাব দিল না।

সোমক প্রথমদিকে বুঝতে পারত না, ওরা কেন এরকম করছে! পরে বুঝেছিল, যারা পৃথিবী থেকে আসে, তাদের সঙ্গেই ওরা এগুলো করে। তাদের সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করে ওরা।

জনার্দনবাবুও নিশ্চয়ই আলাদা কিছু নন। দু-চারবছর নয়, পাক্কা কুড়ি বছর ধরে এই মার্কারিড গ্রহের পারদের খনিতে পড়ে আছেন। ওঁর চোখের চাউনিতেও সেই চাপা ঈর্ষা টের পাচ্ছে সোমক। তবুও যে উনি ইনভেস্টিগেটর সোমক লাহিড়ির সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলে যাচ্ছেন, সেটা সম্ভবত চাকরির খাতিরে। অন্য কোনো কারণ থাকলেও, এখনই সেটা বোঝা সম্ভব নয়।

খেতে-খেতেই সোমক জনার্দনবাবুর কাছ থেকে এই মার্কারিড গ্রহের উপনিবেশ সম্বন্ধে কিছু তথ্য জেনে নিচ্ছিল। যেমন, পঞ্চাশ বছর আগে প্রথম এই গ্রহ আবিষ্কৃত হয়। প্রায় একইসময়ে পারদের খনিটাও খুলে যায়। এখন এখানে লেবার আর অফিসার মিলিয়ে মাত্র একশো-কুড়িজন লোক কাজ করে। আর রয়েছে চল্লিশজন সেনটোর।

দ্বিতীয় তথ্যটা শুনে সোমক অবাক হয়ে জনার্দনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। বিগত প্রায় দুশোবছর ধরে মানুষ সেনটোরদের দাস হিসেবে ব্যবহার করছে। তবে ওদের পপুলেশন এই মুহূর্তে খুব কম। সেইজন্যেই মার্কারিডের মতন ছোট্ট একটা উপনিবেশে চল্লিশ-জন সেনটোর কাজ করছে জেনে সোমক অবাক হয়েছিল। জনার্দনবাবু বললেন, 'উপায় নেই। আমাদের মার্কারি-প্ল্যান্টের টক্সিক-এনভায়রনমেন্টের মধ্যে মানুষ কিংবা রোবট কেউই টিকতে পারে না। পারদের ধোঁয়ায় মানুষের নার্ভ জ্বলে যায়, রোবটের সার্কিট। ওই চল্লিশটি সেনটোরই যা ভরসা।'



জনার্দনবাবুর কাছ থেকে আরও জানা গেল, মানুষই হোক বা সেনটোর, সকলেরই বাস ওই টাউনশিপের পাঁচিলঘেরা চৌহদ্দির মধ্যে।

কাল রাতে এখানে পৌঁছোনোর ফলে ইতোমধ্যে টাউনশিপ জায়গাটা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আন্দাজ হয়ে গেছে সোমকের। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ষোলো একরের টাউনশিপ, তার বাইরে চওড়া রাস্তা। রাস্তার উলটোদিকে আরও দুর্ভেদ্য কাঁটাতারের বেড়ার আড়ালে মার্কারি-প্ল্যান্ট আর মাইলের পর মাইল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা খনি। সেখানে পে-লোডার, এক্সক্যাভেটর আর ডাম্পারের অবিরাম আনাগোনা। কলোনির বাইরের ওই রাস্তাটাই স্পেস-স্টেশনে গিয়ে শেষ হয়েছে। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের লাইফ-লাইন ওই স্পেস-স্টেশন।

টাউনশিপ আর প্ল্যান্ট। পারদের আকরিক, মানে সিনাবারের খনি আর স্পেস-স্টেশন। ব্যস। এইটুকুতেই কলোনি শেষ। বাকি গ্রহটা পঞ্চাশ বছর আগে যেমন ছিল, সেইভাবেই রয়ে গিয়েছে। সেখানে কোনো পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজন পড়েনি।

শূন্য প্লেটের ওপরে আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে-কাটতে সোমক তথ্যগুলোকে মাথার ভেতরে সাজিয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ জনার্দন বোস জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কিছু নেবেন স্যার? টক-দই দিতে বলি একটু?' সোমকের সম্বিৎ ফিরল। বুঝতে পারল, জনার্দনবাবু তাকে উঠতে বলছেন। সে হাসিমুখে বলল, 'একদম না। আর কিচ্ছু লাগবে না। ফার্স্টক্লাস খেলাম'। তারপর টিনের চেয়ারটা পেছনে ঠেলে উঠে পড়ল। জনার্দনবাবু বললেন, 'হাত ধোয়ার বেসিন বাইরে আছে, স্যার। আপনি যান। আমি বিলে সই করে আসছি।'

মার্কারি-মাইনসের ক্যান্টিনটা ছিল এয়ার-কন্ডিশনড। সেখান থেকে বাইরে বেরোতেই রোদের আঁচে সোমকের মুখটা ঝলসে গেল। না, সত্যিকারে ঝলসে যায়নি। সেরকম গ্রহ কিংবা অ্যাস্টারয়েডেও গিয়েছে সোমক, যেখানে প্রোটেকশন না নিয়ে খোলা জায়গায় বেরোলে সত্যিকারেই চামড়া পুড়ে যায়। মার্কারিডের আবহাওয়া অতটা উত্তপ্ত নয়। এরকম রোদ সে অ্যারিজোনা কিংবা ইউগান্ডাতেও দেখেছে।

সোমক একবার চোখ কুঁচকে আকাশের দিকে তাকাল। মার্কারিডের আকাশে দুটো সূর্য। পৃথিবীর সঙ্গে আরও কিছু কিছু তফাত আছে এই খুদে গ্রহের। যেমন মাধ্যাকর্ষণের টান এখানে অনেকটাই কম। কিন্তু গড় তাপমাত্রা আর বাতাসের উপাদানগুলো প্রায় পৃথিবীর মতন বলেই এখানে খনির কাজে মানুষকে লাগানো গেছে।

যে গ্রহগুলোর পরিবেশ পৃথিবীর থেকে অনেকটাই আলাদা, সেইসব গ্রহে রোবট দিয়ে খনির কাজ চালাতে হয়। অল্প কিছু মানুষ থাকে শুধু রোবটগুলোকে দেখাশোনা করার জন্যে। কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে থাকতে হয় তাদের; বেরোলে মরে যাবে। মরে যায়ও মাঝেমধ্যে। তখন সোমক লাহিড়ির মতন কাউকে এনকোয়ারিতে যেতে হয়।

রুটিন-এনকোয়ারি। একশোর মধ্যে নব্বইটা কেস আসলে আত্মহত্যা ছাড়া কিছু নয়। দিনের পর দিন বন্ধ ঘরের মধ্যে থাকতে-থাকতে একদিন হয়তো মনে হয়, দরজা খুলে দেখি! হয়তো মনে হয়, বাইরে সবুজ বন রয়েছে, নদী রয়েছে, দিগন্তে বরফে ঢাকা পাহাড় রয়েছে। প্রোটেকটিভ-গিয়ার ছাড়াই বেরিয়ে যায় তারা, আর বেরিয়ে দেখে, ছাইয়ের পাহাড়। কিংবা শুকনো-বরফের প্রান্তর। মুহূর্তের মধ্যে তারা পুড়ে যায়, ঠান্ডায় জমে যায়। কিংবা তাদের রক্তে মিশে থাকা নাইট্রোজেন শিরা-ধমনি ফাটিয়ে বেরিয়ে আসে।

মার্কারিডে সুইসাইড নেই, কারণ এখানে মানুষরা ইচ্ছেমতন বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে, একে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে পারে। আকাশ দেখতে পায় এরা। এগুলোই সেফটি-ভালবের কাজ করে-মনের সেফটি-ভালব। পাগল হওয়ার হাত থেকে মানুষকে বাঁচায়।

বেসিন থেকে হাতের আঁজলায় জল নিয়ে সোমক লাহিড়ি মুখে আর ঘাড়ে জলের ঝাপটা দিল কয়েকবার। মুখ মুছতে-মুছতে একবার পেছনের দিকে তাকাল। জনার্দনবাবু এখনও ক্যাশ-কাউন্টারের লোকটার সঙ্গে হাত-পা নেড়ে কথা বলে চলেছেন। সোমক একটা সাইকেল-স্ট্যান্ডের শেডের নীচে দাঁড়িয়ে ওঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। অপেক্ষা করতে-করতে আবার ফিরে গেল চাকরি-জীবনের শুরুর সেই অস্বস্তিকর দিনগুলোয়। তার ঠোঁটে একটু হাসি ফুটে উঠল। মাইনিং-কলোনির র‍্যাগিং-এর হাত থেকে বাঁচার জন্যে সে একটা উপায় বার করেছিল। এখনও সেটাই মেইনটেইন করে চলেছে। কাজেও দিচ্ছে।

আর কিছু না, সাদা শার্ট আর নীল ব্লেজারের বদলে ইস্ত্রিবিহীন খাকি জামা-প্যান্ট, চুলে ক্রু-ছাঁট আর পায়ে ভারী সোলের ইন্ডাস্ট্রিয়াল-বুট। অর্থাৎ, আমি তোমাদেরই লোক, এরকম একটা মেক-আপ।

চেষ্টাটা সফল হয়েছিল। শুধু যে বুলিইং কমে গিয়েছিল তাই নয়। ওরা, মানে ওই লেবার-ক্লাসের লোকেরা খোলা মনে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিল। সোমকের এনকোয়ারির কাজও তারপর অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। এখনও সোমক সহজ মেলামেশায় বিশ্বাসী।

মার্কারিডে এই প্রথমবার পা রাখল সোমক। গ্রহটার একটা রুক্ষ সৌন্দর্য রয়েছে। সমতলভূমি নেই বললেই চলে। নৈবেদ্যর থালায় চালের মুঠির মতন অজস্র ছোটো-বড়ো টিলায় সারা গ্রহটা ভরতি। সেরকমই একটা ছোটো টিলার মাথায় এই ক্যান্টিন। সোমক যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান থেকে নীচে তাকালে পায়ের

নীচে পুরো টাউনশিপটাই পরিষ্কার দেখা যায়। লেবারদের থাকার জন্যে যে ছোটো-ছোটো বাড়িগুলো তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলোর বিন্যাসের মধ্যে কোনো পরিকল্পনার ছাপ নেই। ক্যাম্পাসের মধ্যে এখানে-ওখানে অপরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলো। বরং উচ্চপদস্থ অফিসারদের যে-বাংলোগুলো ওই লেবার-হাটগুলোর সঙ্গে সম্মানজনক দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলো বেশ সাজানো-গোছানো। ওর মধ্যেই একটা বাংলোকে এরা গেস্ট-হাউস হিসেবে ব্যবহার করে এবং সেখানেই সোমকের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। জনার্দনবাবু বলেছেন, আজ রাত থেকে খাওয়ার জন্যেও তাকে আর এই ক্যান্টিনে আসতে হবে না। পছন্দমতন খাবার গেস্ট-হাউসেই পৌঁছে যাবে।

না, নিজের থাকা-খাওয়া নিয়ে খুব একটা ভাবছে না সোমক। সুখী প্রকৃতির লোক সে নয়। ছোটোবেলা থেকেই তার কষ্ট সহ্য করার অভ্যেস আছে। বিয়ে হওয়ার পরে বছর-পাঁচেক জীবনে একটু ডিসিপ্লিন এসেছিল; একটু সময়ে চান করা, সময়ে খাওয়া এবং বাইরের খাবার কম খাওয়া, এই আর কী। দু-বছর আগে হেন্ড্রিকা তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে আবার জীবনটা অগোছালো হয়ে গেছে। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে — ভাবে সোমক। এখন ট্যুরে বেরোলে আর বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে না। রাত জেগে পড়াশোনা করলেও কেউ রাগারাগি করে না।

এইসব নিয়েই তো হেন্ড্রিকার সঙ্গে অশান্তি শুরু হয়েছিল। আর্জেন্টিনার মেয়ে হেন্ড্রিকা। ঘরোয়া, নরম-সরম। হেন্ড্রিকা খুব সংসার করতে চাইত। সন্তান চাইত। সোমক ওকে সময় দিতে পারত না। এখন আপশোশ হয়। গ্যালাকটিক-ট্রেড-অর্গানাইজেশনের কুৎসিত দিকগুলো যতই সোমকের সামনে খুলে যাচ্ছে, ততই তার মনে হচ্ছে, এদের জন্যে প্রাণপাত না করে হেন্ড্রিকাকে সময় দেওয়াই উচিত ছিল।

আপাতত জোর করেই হেন্ড্রিকার মুখটাকে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দিল সোমক। এখন স্মৃতিচারণার সময় নয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটা কঠিন কাজ সমাধা করতে হবে তাকে।

এখানে আসার আগে মার্কারিড গ্রহটা সম্বন্ধে কিছুটা পড়াশোনা করার চেষ্টা করেছিল সোমক, তবে তার জন্যে রাত জাগতে হয়নি। মার্কারিড সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য গ্যালাকটিক ট্রেড অর্গানাইজেশনের আর্কাইভে ছিল, সেটুকু পড়ে শেষ করতে আধঘণ্টার বেশি সময় লাগেনি তার।

জি.টি.ওর এই বেনিয়া-মানসিকতাটাও আজকাল সোমককে খেপিয়ে তোলে। একটা কলোনি মানে কি শুধুই তার অর্থকরী ফসল কিংবা খনিজ? আর কিছু নয়? তার পাখি নয়, তার গাছ নয়, জীবজন্তু নয়? কোনো তথ্য থাকবে না তাদের নিয়ে? মানুষ পা রাখার আগে কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী থাকত কি সেখানে? তারা কি বাধা দিয়েছিল ভিনগ্রহের দুপেয়ে হানাদারদের? কাদের উৎখাত করে কলোনি গড়ে উঠল? জি.টি.ওর আর্কাইভে এসব কিছুই থাকে না।

থাকে না। ইচ্ছে করেই রাখে না ওরা। কিন্তু রাখা দরকার। যে-কোনো জায়গাতেই মানুষের অপরাধের ধরনের সঙ্গে তার পরিবেশের যোগ থাকে — সেটা পৃথিবী হোক বা অন্য কোনো গ্রহ। এখানেও আছে, এই মার্কারিডে। সোমক সে-ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সে মার্কারিডের ভূগোল-ইতিহাস নিয়ে বেশি কিছু জানতে পারেনি।

সোমকদের ইনভেস্টিগেশন-উইং-এ মার্কারিডের নামটা প্রথমবার ভেসে উঠেছিল ঠিক একবছর আগে, গ্যালাকটিক-ইয়ার নব্বইয়ের অক্টোবরে। সেবার একটানা যৌন-উপবাসের বিরুদ্ধে এখানকার লেবাররা একটা ছোটোখাটো বিদ্রোহ করেছিল। চেয়ার-টেবিল পোড়ানো, খনিতে হরতাল এইসব আর কী। সেই কেসটা সোমক ডিল করেনি। তবে যারা করেছিল তাদের কাছ থেকেই জানতে পেরেছিল, মার্কারিডে নারী-শ্রমিক তো নেইই, ওখানে পৃথিবী থেকে প্রস্টিটিউট অবধি পাঠানো যায় না।

গ্রহটা যে নারীদের বসবাসের পক্ষে অনুকূল নয়, সেটা কলোনি গড়ে তোলার প্রথমদিকেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ ওই মাধ্যাকর্ষণের দুর্বলতা। যতটা গ্র্যাভিটেশনাল-পুল থাকলে ঋতুরক্ত জরায়ু থেকে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে, মার্কারিডের মাধ্যাকর্ষণ তার থেকে অনেক কম। সেইজন্যেই প্রথম-দলের

নারীকর্মী এবং গণিকারা অসহ্য যন্ত্রণা সয়ে এখান থেকে ফিরে গিয়েছিল। তারপর থেকেই এখানকার শ্রমিক এবং কর্মী সকলেই পুরুষ এবং তাদের নারীসঙ্গহীন জীবন কাটাতে হয়।

একবছর আগের সেই স্ট্রাইক পৃথিবীর মাটিতে বসেই মিটিয়ে দেওয়া গিয়েছিল, যদিও তার জন্যে জি.টি.ওর তহবিলে ভালোরকম টান পড়েছিল। এদের বেতন অনেকটাই বাড়াতে হয়েছিল। চাপের ব্যাপার, তবুও এটা জি.টি.ওকে মেনে নিতে হয়েছিল, কারণ সেই সময়ে কিছু অ্যান্টি-কলোনিস্ট অর্গানাইজেশন ব্যাপারটা নিয়ে মিডিয়ায় ভালোই শোরগোল ফেলে দিয়েছিল। তা ছাড়াও ওদের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল, দু-বছর অন্তর প্রতিটি শ্রমিক দু-মাসের সবেতন ছুটি পাবে, যার নাম দেওয়া হয়েছিল সেক্স-লিভ। এখনও কাউকে সেই ছুটি দেওয়া হয়নি। জি.টি.ও অনেক প্রতিশ্রুতিই পালন করে না। এটাও করবে কিনা সোমক জানে না।

একবছরের মধ্যেই যে সেই একই হতচ্ছাড়া কলোনিটা আবার ঝামেলা পাকাবে, সেটা তখন ওরা কেউই আন্দাজ করতে পারেনি।

এবার যেটা হয়েছে, সেটা আরও মারাত্মক। মাসখানেক আগে, ঠিকঠাক বলতে গেলে গ্যালাকটিক ক্যালেন্ডারের নভেম্বর মাসের সতেরো-তারিখ, এখানকার দুজন শ্রমিক নিখোঁজ হয়ে যায়। লোকাল-প্রবলেম, লোকালিই মিটিয়ে নেওয়া যেত, যদি ওই লোকদুটোকে জীবিত না হোক, মৃত অবস্থাতেও পাওয়া যেত। কিন্তু পাওয়া যায়নি।

খবরটা মিডিয়ার নজরে আসা মাত্রই সেই অ্যান্টি-কলোনিস্ট আউটফিট হাওয়া গরম করে তুলল। আমরা কি আমাদের ছেলেগুলোকে বাইরের গ্রহে মরতে পাঠাচ্ছি নাকি? বাড়ির বেড়ালটা হারিয়ে গেলেও আমরা খোঁজখবর করি, আপনারা তো দুজন মানুষকে সেটুকু গুরুত্বও দিচ্ছেন না; নিশ্চিন্তে ঠান্ডা ঘরে বসে আছেন, ইত্যাদি। সামনে জি.টি.ওর বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসের ইলেকশনও আছে, তাই সোমকের চেয়ে কিছুটা জুনিয়র দু-জন ইনভেস্টিগেটরকে তাড়াহুড়ো করে তখনই মার্কারিডে পাঠানো হয়েছিল।

ওরা এখানে এসে পৌঁছেছিল দোসরা ডিসেম্বর। তেসরা ডিসেম্বর সকাল থেকে তাদের দুজনকেও আর দেখা যায়নি। তাদের খুঁজে পাওয়ার জন্যে এই কলোনির সিকিউরিটি-স্টাফেরা যত চেষ্টা করেছে সবই বিফলে গেছে।

এবার কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই এক অন্যরকমের মাত্রা পেয়ে গেল। জি.টি.ওর দুজন ইনভেস্টিগেটর হারিয়ে যাওয়া মানে তো শুধু দুজন মানুষের হারিয়ে যাওয়া নয়; অর্গানাইজেশনের সর্বশক্তিমান ইমেজটা নষ্ট হয়ে যাওয়া। মার্কারিডের খুব কাছেই অন্য একটা কলোনিতে সেই মুহূর্তে একটা কাজে ব্যস্ত ছিল সোমক। সাতই ডিসেম্বর তার কাছে লাল বর্ডারের অর্ডার গিয়ে পৌঁছোলো, 'যে অবস্থায় আছ সেই অবস্থাতেই মার্কারিডে চলে যাও এবং ব্যাপারটার কিনারা করে ফেরো।' সেই অনুযায়ী পনেরোই ডিসেম্বর রাতে এখানে ল্যান্ড করল সোমক আর আজ ষোলো-তারিখ দুপুরে সে প্রথমবারের জন্যে সুপারভাইজারকে মিট করল এখানকার ক্যান্টিনে।

জনার্দনবাবু ইতিমধ্যে বিল মিটিয়ে ফিরে এসেছিলেন। সোমকের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলুন স্যার। এই লাঞ্চ-ব্রেকের সময়টাতেই একটু বসতে পাই। বাকি সারাক্ষণই তো দেখছেন এই পিট থেকে ওই পিটে দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াচ্ছি। চলুন, আমার অফিসঘরে গিয়েই বসি। আপনার যা জানার আছে, ওখানে বসেই বলবেন'।

সুপারভাইজারের অফিসঘরটা আয়তনে ছোটো নয়; কিন্তু সাতটা আলমারি, বারোটা চেয়ার, একটা সেক্রেটারিয়েট-টেবিল আর এদিকে-ওদিকে মেঝের ওপরে পড়ে থাকা নানারকমের মেশিনের জন্যে পা ফেলার জায়গা কম। সেক্রেটারিয়েট-টেবিলের সমকোণে একটা ছোটো টেবিলের সামনে বসে একটি কমবয়সি ছেলে সাইকো-বোর্ডে সম্ভবত সেক্স-গেম খেলছিল। কিছু অশ্লীল চিন্তার ঝলক সোমকের মনে ফুটে

উঠেই মিলিয়ে গেল। ওদের ঘরে ঢুকতে দেখেই ছেলেটি তাড়াহুড়ো করে সাইকো-বোর্ড শাট-ডাউন করে পালাল।

'যত আপদ!'। গরগর করে উঠলেন জনার্দনবাবু। তারপর দরজার পাল্লাদুটো ভেজিয়ে দিয়ে সোমককে বললেন, 'বলুন স্যার। কী জানতে চান!'

সোমক বলল, 'আপনি কোনো রিপোর্ট বানিয়েছেন?।'

'না স্যার। রিপোর্ট তো বানানোর কথা ছিল আপনার আগে যে-দুজন এসেছিলেন, তাদের। এবার আপনি বানাবেন। আমাকে শুধু বলা হয়েছে আপনাদের সঙ্গে সবরকমের সহযোগিতা করতে। সে তো আগেও করেছিলাম, এবারও করব।'

একজন সুপারভাইজারের কাছ থেকে এরকম বোকা-চালাকের মতন একটা উত্তর আশা করেনি সোমক। লোকটাকে একটু ঝাড়বে কিনা ভাবছিল সে। তার আগেই, বোধহয় তার মুড বুঝতে পেরেই জনার্দনবাবু তাড়াহুড়ো করে বললেন, 'আমার সিকিউরিটি-অফিসারকে বলছি স্যার, আপনার সঙ্গে আজ সন্ধেবেলায় দেখা করে নিতে। ওর কাছে একটা রিপোর্ট নিশ্চয়ই থাকবে।'

সোমক রুক্ষ স্বরে বলল, 'সন্ধেবেলায় কেন? এখনই নয় কেন? কল হিম অ্যাট দিস মোমেন্ট।'

জনার্দনবাবু শুকনো মুখে বললেন, 'পারবে না স্যার। ও তো আসলে অন্য সকলের মতোই লেবারের কাজ করে। সিকিউরিটি-অফিসের কাজটা ওর অ্যাডিশনাল ডিউটি; বিনা মাইনের পোস্ট। আমরা খুব টাইট কন্ডিশনে আছি স্যার, আপনাকে বোঝাতে পারব না। খুব স্টাফ-শর্টেজ আমাদের।'

'তো?।'

'ওর নাম অনঘ, স্যার। অনঘ আজ সকালেই মাইনস-এর নীচে নেমে গেছে। আমাদের এখানে ব্যবস্থাপত্র খুব প্রিমিটিভ। ওকে চট করে খবর পাঠানোর মতন তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। ইনফ্রা-স্ট্রাকচারটাকে আর একটু ভালো করতে পারতাম, যদি জি.টি.ও থেকে আর একটু বেশি গ্র্যান্ট পেতাম।'

সেই মুহূর্তে এইসব নাকে-কান্না ভালো লাগছিল না সোমকের, তাই হাত তুলে জনার্দন বোসের বকবকানি থামাল। তারপর বলল, 'তাহলে আপনার সিকিউরিটি-অফিসারের সঙ্গে কখন, কীভাবে দেখা করার সৌভাগ্য হবে?।'

'ও স্যার আপনার কাছে চলে যাবে। ডিউটি শেষ করে ওপরে উঠলেই ওকে বলব আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

সোমক বলল, 'ঠিক আছে। সে যখন আসবে আসবে। আপাতত আপনি আমাকে বলুন।'

সোমকের কথার মধ্যেই দু-হাত তুলে হাউমাউ করে উঠলেন জনার্দন বোস, 'আমি কী বলব স্যার? সত্যিকথা বলতে কী খুব একটা মাথা লাগাইনি ব্যাপারটায়। আমার মাথায় অনেক চাপ। প্রতি মাসে প্রোডাকশন ফল করছে আর আমি অথরিটির কাছে ঝাড় খাচ্ছি। আর দেখুন, মাইনস-এ অ্যাকসিডেন্ট তো হয়েই থাকে। তফাতের মধ্যে এবারে ডেড-বডিগুলো খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে কী ভাবব বলুন তো'।

'তার মানে! ওই দুজন লেবার কি খনির মধ্যে নেমে হারিয়ে গিয়েছে নাকি? আমার কলিগেরা, তারা নেমেছিলেন খনিতে? আমি তো অন্যরকম শুনেছি।'

কোণঠাসা জন্তুর মতন এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে জনার্দনবাবু বললেন, 'তা ঠিক। ওরা টাউনশিপের মধ্যে থেকেই মিসিং হয়েছে।'

'তবুও আপনি বদারড নন? আপনি জানেন না, এইধরনের দূরের কলোনিগুলোতে হামেশাই এলিয়েন-অ্যাটাক হয়? আমি কি এমনি-এমনি এতদূরে ছুটে এসেছি?।'

জনার্দনবাবু প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ করে নখ খুঁটতে লাগলেন।

সোমক কিছুক্ষণ ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর নরম সুরে বলল, 'আমি শুনেছি, ওরা চারজনেই গোপনে টাউনশিপের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল। বেরোলে কী হতে পারে, কোনো আইডিয়া আছে

আপনার? একটু আলোকপাত করুন না। আমি আপনার হেল্প চাইছি।'

জনার্দন বোস এইবার মরিয়ার মতন সোমকের চোখের ওপর চোখ রেখে বললেন, 'দেখুন, ওই বাইরের জগৎটাকে আমরা চিনি না, আর চিনি না বলেই ভয় পাই। এই তো, মাস-চারেক আগেই অনঘ আর আমাদের আর একজন স্টাফ ট্রেকিং করতে বেরিয়েছিল। দুজনেই একটু অন্যরকম ক্যারেকটার, প্রাণে শখ-টখ ছিল। ফিরে এল যখন, তখন দুজনেরই গায়ে এত বড়ো-বড়ো ঘা। সেই ঘা-গুলো থেকে আবার অন্ধকারে জোনাকির মতন আলো বেরোত। ডাক্তারবাবু বললেন, কোনো বায়োলুমিনিসেন্ট ফাঙ্গাস থেকে ইনফেকশন হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে সে-যাত্রায় ওরা বেঁচেছিল। কাজেই আমার দুজন লেবার বা আপনার সহকর্মী দুজন যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে ওদের এরকম কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের খপ্পরে পড়ে মারা যাওয়াটা আশ্চর্য কিছু নয়, অন্তত আমার কাছে তো নয়ই।'

'আপনারা তো বডি-ট্র্যাকার ইউজ করেছিলেন শুনলাম।'

'বডি-ট্র্যাকার অনেক সময়েই কাজ করে না। এখানে চারদিকেই পাথুরে জমি, বড়ো-বড়ো বোল্ডার চারিদিকে। ওরকম কোনো পাথরের নীচে জীবিত বা মৃত অবস্থায় কেউ পড়ে থাকলে, আকাশ থেকে তাকে ট্র্যাক করা যায় না। আর আপনার কলিগ দুজনের শরীরে মার্কারিডের আইডেন্টিটি-চিপস ইনস্টল করা ছিল না, যেমন আপনারও নেই। তাই ওরা খোলা জমির ওপরে পড়ে থাকলেও এখানকার বডি-ট্র্যাকার ওদের ট্রেস করতে পারবে না।'

সোমক কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'এখানে কেউ কলোনির বাইরে বেরোয় না? কাজের পরে তাহলে এখানে মানুষ করে কী?।'

জনার্দনবাবু বিরক্ত মুখে বললেন, 'চাইলে করার মতন অনেক কিছুই ছিল। টাউনশিপের মধ্যেই খেলার মাঠ আছে, সিনেমা হল আছে। আপনাদের জি.টি.ওর বড়োকর্তাদের কাছে অনেক দরবার করে দু-বছর আগে একটা স্যুইমিং-পুলও বানিয়ে দিয়েছিলাম।'

আক্ষেপের ভঙ্গিতে দু-দিকে ঘাড় নাড়লেন জনার্দন। 'কেউ যায় না। ওসব সিনেমা হলে, খেলার মাঠে কিংবা স্যুইমিং-পুলে কেউ যায় না, বুঝলেন। আসলে এখানকার লোকজনের মনটাই মরে গেছে। ডিউটি-আওয়ারের বাইরে সবাই সিনাবার ট্যাভার্নে গিয়ে বসে থাকে।'

'সেটা কী?।'

'পানশালা। মানে চালু কথায় মদের ঠেক।'

সোমক বলল, 'মনটা মরে যাওয়ার কারণ কী? মেয়েদের অনুপস্থিতি?।'

জনার্দন বোস যাকে বলে 'সপ্রশংস দৃষ্টিতে' সোমকের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একদম ঠিক ধরেছেন। এইটাই আমি আপনাদের বড়োকর্তাদের বোঝাতে পারি না। যৌনতা মানে শুধুই কপুলেশন নয়। এই মার্কারিডের মতন গ্রহে টানা দু-বছর থাকলে ওঁরা বুঝতে পারতেন, একটা মেয়েলি গলার আওয়াজ, বারান্দার তারে শুকোতে দেওয়া একটা পিঙ্ক জ্যাকেট, ফুটপাথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ ল্যাভেন্ডার-পারফিউমের সুগন্ধ — এগুলোও একজন পুরুষের মানসিক সুস্থতার পক্ষে কত জরুরি। অ্যান্ড ভাইসি-ভার্সা।'

এবার সোমকের মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকার পালা।

বয়সের চেয়ে বেশি বুড়িয়ে যাওয়া এই লোকটা, এই জনার্দন বোস, কত সুন্দর করে একটা সত্যকে উপস্থাপন করলেন। সোমকের হঠাৎই মনে পড়ে গেল কলকাতায় তার নিজের ফ্ল্যাটটার কথা। এখনও মাঝে মাঝে ড্রয়ারের কোণ থেকে একটা সেফটিপিনের পাতা কিংবা স্নানঘরের ক্লজেট থেকে খালি হেয়ার-রিমুভারের শিশি বেরিয়ে আসে। কিছুক্ষণের জন্যে কাঁপিয়ে দিয়ে যায় তাকে। মনে পড়ে, বেডরুমের নীল নাইট-ল্যাম্পটা কতদিন ধরে খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। তাই নিয়ে আর অনুযোগ করবার কেউ নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে সোমক বলল, 'ঠিকই বলেছেন। আচ্ছা জনার্দনবাবু, আপনার কী মনে হয় আপনি নিজেও সেক্সের অভাবে কাতর? আপনার মধ্যেও কিন্তু বেশ আলস্য দেখতে পাচ্ছি।'

জনার্দনবাবু হাওয়ায় হাত নেড়ে বললেন, 'সবাই, সবাই। ওই চল্লিশটা সেনটোর বাদে আর সবাই সেক্স-স্টার্ভড, সবাই লেথার্জিক। আমিও। কেন লুকোব বলুন। পেটে ভাত না পড়লে লুকোতাম?।'

ওঁর কথার ভঙ্গিতে সোমক হেসে ফেলল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জনার্দন বোসের পিঠে হাত রেখে বলল, 'যাই হোক, ছেলেটিকে বিকেলের মধ্যে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। ওর নামটা কী যেন বললেন?।'

জনার্দন বোস বললেন, 'অনঘ মৈত্র। পাঠিয়ে দেব স্যার।'

সোমক গেস্ট-হাউসের দিকে পা চালাল। গরমটা সত্যিই অসহ্য। আর এই ধুলো। আর একবার স্নান করতে হবে।

বাকি দুপুর এবং পুরো বিকেলটা অনঘ মৈত্র নামের সিকিউরিটি-অফিসারের প্রতীক্ষায় ঘরে বসেই কাটাল সোমক। ঠিক সন্ধে ছটার সময় সে একবার জনার্দনবাবুকে ফোন করল। জনার্দনবাবু খুব অবাক গলায় বললেন, 'সেকী স্যার! আমি তো ওকে খনি থেকে ওঠামাত্রই মেসেজ পাঠিয়েছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। যায়নি? আচ্ছা, আমি দেখছি।'

আরও একঘণ্টা অপেক্ষা করে, ঠিক সন্ধে সাতটার সময় সিনাবার ট্যাভার্নের দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল সোমক। ট্যাভার্নের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকবার আগে একবার আকাশের দিকে তাকাল সে। আকাশে এখন অদ্ভুত সবুজ এক অস্ত-আভা। এখানে অনেক রাত অবধি আকাশে আলো থাকে।

দরজা ঠেলে ট্যাভার্নের ভেতরে পা দিতেই সোমক সেই অতিপরিচিত গন্ধটা পেল। আগে ও ভাবতো গন্ধটা বুঝি শুধু পৃথিবীর পানশালাতেই পাওয়া যায়। এখন ও জানে, মহাবিশ্বের সর্বত্র মানুষের তৈরি পানশালার গন্ধ এটাই। পেঁয়াজ, ঘাম, নিকোটিন এবং অ্যালকোহলের মিলিত একটা গন্ধ। একটা বায়বীয় ককটেল।

সিনাবার ট্যাভার্নে এখনও খদ্দেরদের তেমন ভিড় জমেনি। জমবে। আকরিক সিনাবারের লাল ধুলো মেখে খনি-শ্রমিকেরা এখন লেবার-হাটের বাড়িগুলোর দিকে ফিরে যাচ্ছে। চান-টান করে এখানেই ফিরে আসবে তারা। ফাঁকা পড়ে থাকবে টেনিস-কোর্ট, স্যুইমিং পুল আর সিনেমা-হল।

বাইরে এখনও আকাশে আলো থাকলেও, ট্যাভার্নের ভেতরটা ছায়ায় ঢাকা। বিশাল ঘরটার দু-প্রান্তে দুটো অল্প পাওয়ারের বালব জ্বলছে; একটা দরজার কাছে আর অন্যটা বার-কাউন্টারের মাথায়। বাকি ঘরটা প্রায় অন্ধকার। এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলের মানুষের মুখ দেখা যায় না। হয়তো যারা এখানে আসে, তারা নিজেদের মুখগুলো লুকিয়ে রাখতেই চায়। তাদের দাবি মেনেই অল্প আলোর ব্যবস্থা।

দু-হাতের চেটোয় আড়াল করে একটা দেশলাইকাঠি জ্বালিয়েছিল সোমক। সিগারেট ধরিয়ে কাঠিটা খোলা জানলার বাইরে ছুড়ে ফেলে দিতে-দিতেই ও চোখের কোনা দিয়ে দেখল, মেঝের ওপরে পায়ের চাপ দিয়ে একটা ছেলে নিজের চেয়ারটাকে আর একটু অন্ধকারের দিকে পিছিয়ে নিল। সোমক আর দেরি না করে কয়েকটা লম্বা পদক্ষেপে ছেলেটার কাছে পৌঁছে গেল। বলল, 'অনঘ! অন্য কথায় যাবার আগে জেনে নিই, এত দূর থেকে আমাকে চিনলেন কেমন করে?'

ছেলেটা থতোমতো খেয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। তবে খুব শিগগিরই মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফিরিয়ে আনল। বলল, 'আপনাদের পৃথিবীর অভ্যেসগুলো পৃথিবীর বাইরে বেরোলেও বদলায় না। আমরা কেউ হাতের চেটোয় আড়াল করে দেশলাই জ্বালি না, কারণ, মার্কারিডে বাতাস বয় না।'

মার্কারিডে বাতাস বয় না! তথ্যটা সত্যিই অবাক করল সোমককে। ও জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?।'

'যতদূর মনে পড়ছে, মন্থর আহ্নিক-গতি আর সমুদ্র না-থাকা এইসবই যেন বলেছিলেন জ্যাকবস্যার। তা ছাড়া আমরা মার্কারিডের লেবাররা কেউই আর আপনার মতন অত সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না। আক্ষরিক

অর্থে খেটে খেটে আমাদের শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে। আপনাদের সোজা শিরদাঁড়া দেখে পৃথিবীর বাসিন্দা বলে চেনা যায়''।

সোমক মনে-মনে বলল, ইনটেলিজেন্ট। আবার সে ভালো করে দেখল অনঘকে। বয়স কত হবে? খুব বেশি হলে ত্রিশ কী বত্রিশ। দোহারা চেহারা। শ্যামলা রঙের মধ্যে কাটা-কাটা নাক-চোখ। গালে, গলায় আর শার্টের স্লিভের বাইরে বেরিয়ে-আসা হাতের চামড়ায় দাগড়া-দাগড়া গোলাপি দাগ — পুড়ে যাওয়া চামড়া নতুন করে গজালে যেরকম দেখতে লাগে, অনেকটা সেইরকম।

দুজনের বসার মতন একটা টেবিলের পাশে অনঘ দাঁড়িয়ে ছিল। কাছের চেয়ারটা টেনে নিয়ে সোমক বসল। অনঘকে বলল, ''বসুন। আমার পরিচয়টা তো সঠিক আন্দাজ করেছেন। নামটা জানেন কি? সোমক। সোমক লাহিড়ি, ফ্রম ইনভেস্টিগেশন-উইং।'

অনঘও আবার ওর ছেড়ে দেওয়া চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল। তারপর বলল, 'জানি। ওই মিসিং লোকগুলোর ব্যাপারে এনকোয়ারি করতে এসেছেন তো? সুপারভাইজার সাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।'

সোমক নরম গলায় বলল, 'এলেন না কেন দেখা করতে?।'

ছেলেটি বলল, 'ইচ্ছে করছিল না। আপনাদের সঙ্গে ইনট্যারাক্ট করতে ইচ্ছে করে না।'

'ওঁদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন? আমার আগে যে-দুজন এসেছিলেন। যাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'বলেছিলাম। বাধ্য হয়েছিলাম বলতে। এটা তো আমার চাকরি। যদিও এর জন্যে বাড়তি কোনো পয়সা পাই না। তবে একটা কথা আপনাকে স্পষ্ট জানিয়ে রাখি, ওই শুড্ডাদুটো পৃথিবীর বাকি লোকেদের মতনই অহংকারী আর হারামি ছিল। আমার সঙ্গে চাকর-বাকরের মতন ব্যবহার করছিল।'

সোমক একবার আড়চোখে দেখে নিল, টেবিলে একটা আধখালি মদের বোতল আর গ্লাস নামানো রয়েছে। সে ঘাড় ঘুরিয়ে ওয়েটারকে হাতের ইশারায় ডেকে আর একটা গ্লাস দিতে বললো। দুজনের মতন গ্রিলড চিকেনের অর্ডারও দিয়ে দিল একসঙ্গে। ওয়েটার গ্লাসটা নিয়ে আসতেই সোমক বলল, 'ভাই অনঘ! আপনার বোতল থেকে একটু খেলে আপত্তি নেই তো?।'

অনঘ মন দিয়ে সোমকের কার্যকলাপ লক্ষ করছিল। প্রশ্নটা শুনেই তাড়াহুড়ো করে উত্তর দিল, 'আরে না না। কী যে বলেন স্যার! আপনি তো দেখছি বেশ অন্যরকম। নিন, নিন। ঢালুন।'

সোমক মদের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেন?'।

'দেখুন স্যার, পড়াশনায় খারাপ ছিলাম না। যদি বাপের হাতে পয়সা থাকত, যদি ঘুষ দিতে পারতাম, তাহলে আমিও আপনাদের মতন পৃথিবীর কোনো অফিসেই চাকরি পেয়ে যেতাম। পাইনি, তাই এখানে পাথর কাটছি। তার মানে তো এই নয় যে, আমাকে জিজ্ঞেস করবে আমরাই আমাদের সহকর্মী দুজনকে খুন করে পুঁতে ফেলেছি কিনা।'

সোমকের মাথাটা আপনা থেকেই নীচু হয়ে গেল। ও জানে অনঘ একবর্ণ মিথ্যে বলছে না। কলোনির লোকেদের সম্বন্ধে জি.টি.ওর অফিসারদের ধারণাটা ওইরকমই। ক্রিমিনালই ভাবা হয় ওদের।

সোমক কথা ঘোরানোর জন্যে বলল, 'লেবারের কাজের ওপরে আবার এই সিকিউরিটি-অফিসারের কাজ করেন কেন?।'

অনঘ হাসল। বলল, 'আসলে আর কেউ ঘাড় পাতেনি। ওই যে, এখানে এসেই জ্যাকবস্যারের প্ররোচনায় ট্রেকিং-এ বেরিয়েছিলাম না, তখনই সুপারভাইজার-সাহেবের ধারণা হয়েছিল, আটঘণ্টা পাথর ভাঙার পরেও আমার মধ্যে আর কিছুটা এনার্জি বাড়তি থেকে যায়। কাজেই আমাকেই গছিয়ে দিলেন কাজটা।'

সোমক হাত বাড়িয়ে অনঘের হাতটা মুঠোর মধ্যে ধরল। বলল, 'আপনার মতন কাউকেই খুঁজছিলাম। স্কিনের এই গোলাপি প্যাচগুলো কি সেই ফাঙ্গাসের ইনফেকশন?।'

'হ্যাঁ স্যার। আর প্লিজ আমাকে 'তুমি' বলুন। আমি বয়সে, মর্যাদায় সবদিক থেকেই আপনার চেয়ে অনেক ছোটো।'

সোমক বলল, 'ওসব মর্যাদা-ফর্যাদা নয়। ছোটোভাই বলেই 'তুমি' বলছি। অনঘ, ট্রেকিং-এ গিয়ে কী দেখলে?।'

বাটি থেকে কয়েকটা সল্টেড-বাদাম হাঁ-মুখের মধ্যে আলতো করে ছুড়ে দিয়ে অনঘ বলল, 'ঠিক ট্রেকিং নয়, এক্সপ্লোর করতেই বেরিয়েছিলাম। জ্যাকবস্যার ছিলেন আমার ক্যাপটেন। উনি একজন ন্যাচারালিস্ট, জঙ্গলকে ভয় পান না। কিন্তু তাতেও সামলানো গেল না। ওই অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটে গেল আর তাই আমাদেরও ফিরে আসতে হল। দেশটা সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারলাম না।

'অথচ দেখার মতন অনেক কিছুই ছিল, জানেন। এখানে বসে আপনি বুঝতে পারবেন না, কারণ এই কলোনিটাকে আমরা অনেকবছর আগেই স্টেরিলাইজ করে ফেলেছি। এখানে পোকা, পাখি, গাছ, আগাছা কিছুই জন্মায় না। কিন্তু উত্তরের পাহাড়ে আমরা সবই পেয়েছিলাম। পৃথিবীর থেকে সব কিছুই একটু আলাদা, কিন্তু ইভোলিউশনের সেই একই ধারায় যা-যা আসার কথা সবই এসেছে দেখলাম।

'যাগগে, ও নিয়ে আর বেশি কিছু বলার মতো জ্ঞান আমার নেই। অন্য একটা কথা বলি। আমি কিন্তু ওই মিসিং-পার্সনদের নিয়ে সিনসিয়ারলিই কাজ করেছিলাম। আপনার আগের দু-জন ইনভেস্টিগেটর এসে পৌঁছোনোর আগে নিজের মতন করে সার্চ করেছিলাম। এমনকি ওরা দুজন হারিয়ে যাবার পরেও প্রচুর খোঁজখবর চালিয়েছি। একটা কথা বিশ্বাস করতে পারেন, এখানে অর্গানাইজড ক্রাইম বলে কিছু নেই, কারণ লুঠবার মতন কিছু পাওয়া যায় না এখানে। পয়সা নেই, মেয়েছেলে নেই — ক্রাইম হবে কেন? সেইজন্যেই অ্যাক্সিডেন্টের কথাই মাথায় আসছে। কিন্তু সেখানেও একটা খটকা রয়েছে।'

সোমক খুব আগ্রহ নিয়ে বলল, 'কেমন খটকা?।'

অনঘ হঠাৎ একচুমুকে গ্লাসের বাকি মদটা শেষ করে গ্লাসটা ঠক করে টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখল। তারপর বলল, 'নাঃ! এখানে নয়। চলুন জ্যাকবস্যারের ঘরে যাই। অ্যাকচুয়ালি, আমার থেকেও বেশি উনিই ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছেন। ভাবাটা অবশ্য ওঁর হবি, সুপার ব্রেন তো।'

সোমক বুঝতে পারছিল, অনঘের একটু নেশা হয়ে গেছে। ও নিজেও গ্লাসের মদ শেষ করে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চল। জ্যাকব কি তোমার বন্ধু?।'

'বন্ধু নয়, গুরু। আমার টিচার। এই প্রথম একজন সেনটোরকে কাছ থেকে দেখলাম। ওরা সত্যিই অসামান্য।'

সোমক চমকে উঠল। বলল, 'জ্যাকবস্যার একজন সেনটোর?।'

'হ্যাঁ স্যার। শরীরে লাল রক্তকণিকা নেই বলে পারদের বাষ্পের মধ্যে দাঁড়িয়ে আট-ঘণ্টা ডিউটি করতে পারেন। কত মজা বলুন তো! সেনটোররা না থাকলে কোটি-কোটি টাকা খরচা করে আপনাদের নিরাপদ প্ল্যান্ট বানাতে হত। এখন সস্তার ফুটোফাটা ফার্নেস আর কনডেনসারে কাজ চলে যাচ্ছে। লোয়েস্ট ইনভেস্টমেন্ট, হায়েস্ট রিটার্ন।'

জানে। সবই জানে সোমক। সেপ্টাম গ্রহের সেনটোরস। নামটা মানুষই দিয়েছে ব্যঙ্গ করে, তবে পৌরাণিক অশ্বমানবের মতন ওরা চারপায়ে হাঁটে না, ওদের পুচ্ছও নেই। ওরাও মানুষের মতন দুপেয়ে জীব। খর্বাকার, কালো, পেশিবহুল এবং কেশহীন। তার ওপরে মুখগুলো ঘোড়ার মতোই লম্বাটে এবং সেইজন্যেই ওদের বলা হয় সেনটোরস।

গত দুশো-বছর ধরে মানুষ সেপ্টাম গ্রহ থেকে হাজারে-হাজারে সেনটোর নারী-পুরুষকে বন্দি করে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে এবং বিভিন্ন কলোনিতে খাটিয়ে মারছে।

'মারছে' কথাটাকে আক্ষরিক অর্থেই ধরতে হবে, কারণ এখন সবচেয়ে অমানুষিক কাজগুলো সেনটোরদের দিয়েই করানো হয়। মেটালের নাগেটস কুড়িয়ে আনার জন্যে গলায় শেকল বেঁধে ওদের সমুদ্রের জলে

ডুবিয়ে দিতে দেখেছে সোমক। নিভে-যাওয়া আগ্নেয়গিরির সুড়ঙ্গের মধ্যে থেকে গলিত গন্ধক তুলে আনতে দেখেছে। এইসব কারণেই মানুষের হাতে ধরা পড়লে একজন সেনটোরের আয়ু আর বড়োজোর দশবছর।

নিজের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান এবং শক্তিশালী একটি প্রজাতিকে যে এইভাবে জন্তুর মতন খাটাতে পারছে মানুষ, তার কারণ একটাই। সেনটোররা যুদ্ধ করতে শেখেনি — না নিজেদের জাতের মধ্যে, না বাইরের গ্রহের আগন্তুকদের সঙ্গে।

সোমক শুনেছে, সেপ্টাম গ্রহটা ছোটো হলেও সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ অঢেল। হিংস্র জন্তু-টন্তুও ছিল না ওখানে। সেইজন্যে ইভোলিউশনের কোনো স্তরেই ওদের স্ট্রাগল করতে হয়নি। ওরা বহু উন্নত যন্ত্রপাতি বানিয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে একটাও বোমা-বন্দুক ছিল না। এদিকে প্রজাতি হিসেবে হোমো-স্যাপিয়েন্স আবার ভয়ংকর হিংস্র। জন্ম থেকেই মানুষের বাচ্চারা বন্দুক নিয়ে খেলা করে। কাজেই ওদের খোঁজ পাওয়ার পরে ওদের নিয়ে যা করার, মানুষ তাই করেছে।

সোমক অনঘকে জিজ্ঞেস করল, 'একজন সেনটোর ছুটি পেয়েছিলেন? তোমার সঙ্গে পাহাড়ে যাবার অনুমতি পেয়েছিলেন?।'

অনঘ বলল, 'সহজে পাননি, স্যার। আমি ওর জন্যে লড়ে গিয়েছিলাম। জনার্দনবাবুও আমাদের হয়ে ওইসময়ে অনেক করেছিলেন। সুপারভাইজার মানুষটি ভালো। উনিই অথরিটিকে রাজি করিয়েছিলেন।'

সোমক জিজ্ঞেস করল, 'জ্যাকবস্যারকে কোথায় পাওয়া যাবে?।'

'ওঁর ঘরেই পাবেন। আমি নিয়ে যাচ্ছি, চলুন।' আধখালি বোতলটাকে নিজের ব্যাকপ্যাকের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে অনঘ সিনাবার ট্যাভার্নের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল; খাবার আর মদের দাম মিটিয়ে পেছন-পেছন সোমক।

পনেরো-মিনিটের মধ্যে অনঘ আর সোমক টাউনশিপের মাঠ পেরিয়ে জ্যাকবের ঘরে পৌঁছে গেল। একটা দোতলা বাড়ির ওপরতলায় কোনার দিকে একটা ছোটো ঘর। পুরো ঘরটাই নানারকমের ম্যাপ, চার্ট, গাছপালার শুকনো ফুল-পাতা আর পতঙ্গের খোলসে ভরতি। একটা দেয়াল জুড়ে বইয়ের র‍্যাক। সোমক খেয়াল করল বইগুলো সবই দর্শন, কবিতা আর প্রকৃতিবিদ্যার ওপরে। শুধু পৃথিবীর বই নয়, জ্যাকবের সংগ্রহে গ্যালাক্সির অন্যান্য বুদ্ধিমান প্রাণীদের লেখা অনেক বই দেখতে পেল সে।

জ্যাকব নিজেই ওদের সাড়া পেয়ে দরজা খুলে দিলেন। সোমক আর অনঘকে দুটো চেয়ারে বসতে দিয়ে জ্যাকব নিজে বসলেন খাটের ওপরে। সোমক নিজের পরিচয় আর এখানে আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল। উনি মন দিয়ে সব শুনলেন। তারপর বললেন, 'দেখুন, সুপারভাইজার-সাহেব আপনাকে একটা কথা কিন্তু ঠিকই বলেছেন। স্বাভাবিক-অবস্থায় এখানকার কোনো কর্মী টাউনশিপের বাইরে পা রাখবে না, আর তার জন্যে আমরাই অনেকটা দায়ী, আমি আর অনঘ। অজানা জগৎ সম্বন্ধে সবার মনে ভয় তো একটা ছিলই, আমাদের মিস-অ্যাডভেঞ্চারের পরে সেটা আতঙ্কে পরিণত হয়েছে।'

'তাহলে?।'

'তারপরেও তো কোনো টান থাকতে পারে, মিস্টার লাহিড়ি। অপ্রতিরোধ্য কোনো টান। যেরকম টানে মানুষ পাগল হয়ে যায়, বিপদের কথা ভুলে যায়। সেরকমই কিছু হয়তো ওই দু-জন লেবারকে টেনেছিল? তারপর আবার টেনেছিল জি.টি.ওর দুই অফিসারকে।'

সোমক হতাশভাবে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল যে, সে কিছু বুঝতে পারছে না। জ্যাকব নিজেও বিষণ্ণভাবে হাসলেন। বললেন, 'বিশ্বাস করুন মিস্টার লাহিড়ি, আমি আপনাকে ইচ্ছে করে কনফিউজ করছি না। আমি নিজেই খুব কনফিউজড। তবে একটা জোরালো টান ছিল নিশ্চয়ই। কেন বলছি জানেন?।'

সোমক মাথা নাড়ল।

'বুঝতে পারছি অনঘ এখনও ওর ফাইন্ডিংসগুলো আপনাকে বলার সময় পায়নি। আমিই বলছি। জানেন নিশ্চয়ই, এখানে প্রত্যেক লেবারকে রেগুলেশন কিট সাপ্লাই করা হয়। বাড়ির জন্যে ঢোলা পায়জামা আর

ফতুয়া, বাইরে পরার জন্যে কর্ড আর সার্জের ট্রাউজারস আর শার্ট। দু-জোড়া চটি, দু-জোড়া জুতো। জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একটা করে বড়ো সুটকেস আর ব্যাগ। তোয়ালে, সাবান, শ্যাম্পু সবই গুনেগেঁথে দেওয়া হয়, কারণ প্রতিটি জিনিসই নিয়ে আসতে হয় পৃথিবী থেকে।

'মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের দুই লেবার-ভাইয়ের ব্যবহৃত প্রতিটি পোশাক, প্রতি জোড়া জুতো, মায় হাতঘড়ি আর টর্চলাইট অবধি ওদের ঘরেই পাওয়া গেছে। তাই তো অনঘ?'

অনঘ ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

জ্যাকব আবার বললেন, 'একই ফাইন্ডিংস আপনার কলিগ দুজনের ক্ষেত্রেও। তাদেরও যাবতীয় বিলংগিংস ওই বাড়ির মধ্যে পড়ে ছিল। আপনি চাইলে দেখতে পারেন। অ্যাপারেন্টলি তাঁরাও কিছুই নিয়ে বেরোননি। আরও আছে।'

সোমকের যেটুকু অবাক হওয়ার বাকি ছিল, জ্যাকবের পরের কথায় সেটুকুও সম্পূর্ণ হলো। জ্যাকব বললেন, 'এই চারজন মানুষেরই যার-যার রাতপোশাক তার-তার বিছানার পাশে পড়েছিল। যেন ওরা প্রত্যেকেই নগ্ন হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।'

সোমক স্তম্ভিত মুখে একবার জ্যাকব আর একবার অনঘের দিকে তাকাচ্ছিল। কিছুই মাথায় ঢুকছিল না তার। চারজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, যাদের মধ্যে দুজন আবার হাড়েমজ্জায় স্নব, তারা রাতপোশাক খুলে রেখে, জুতো-চটি না পরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে! এটা কীভাবে সম্ভব? নগ্ন হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ওরা? নাকি, অন্য কেউ, অন্য কোনো পোশাক পরিয়ে ওদের নিয়ে গিয়েছিল?

অনঘের নিয়ে-আসা দারুর বোতল থেকে জ্যাকব সরাসরি কিছুটা মদ গলায় ঢেলে হাতের উলটোপিঠ দিয়ে মুখ মুছে নিলেন। তারপর বললেন, 'এইসব নিয়েই গত কয়েকদিন ধরে ভাবছি। ভাবছি, বাড়িটার কি কোনো ভূমিকা থাকতে পারে? এই যে একদম একটেরে একটা বাড়ি থেকেই ওরা চারজনে হারিয়ে গেলে।'

সোমক চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল। বলল, 'সেকি! এটা তো জানতাম না। একই বাড়িতে ছিলেন ওরা?।'

জ্যাকব আর অনঘ দুজনেই অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ তো। আপনি জানতেন না? আপনাকে সুপারভাইজার বোস বলেননি?'

সোমক বলল, 'না। এই পয়েন্টটা উনি বলেননি। অনঘ, ওই বাড়িটা ভালো করে দেখেছিলে? কোনো রক্তের দাগ, আই মিন কোনো স্ট্রাগলের চিহ্ন... ভাঙা দরজা বা জানলার গ্রিল...'

অনঘ বলল, 'না স্যার। কোনো স্ট্রাগলের চিহ্ন ছিল না। ঘরের একটা জিনিস এদিক থেকে ওদিক হয়নি। টেবিলে কাচের গ্লাস ভাঙেনি। মেঝের পাপোশ জায়গা থেকে নড়েনি।'

সোমক কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, 'ওঁরা একই বাড়িতে ছিলেন কেন?।'

'আমাদের দুজন স্টাফের ক্ষেত্রে কোনো প্ল্যান ছিল না। কোম্পানি যেভাবে কোয়ার্টার অ্যালট করেছে, সেইভাবেই ওরা ছিল। দু-বছর ধরে ওই বাড়িটাতেই ছিল ওরা। আপনার কলিগ দুজনের ক্ষেত্রে আমি জানি, ওঁরা নিজেরাই ওই বাড়িটাতে থাকতে চেয়েছিলেন। ওঁরা দেখতে চেয়েছিলেন, সত্যিই ওই বাড়িতে কোনো রহস্যময় ব্যাপার ঘটে কিনা— এমন কোনো ঘটনা, আমাদের মানুষদের বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না।'

সোমক বলল, 'কাল সকালে একবার ওই কোয়ার্টারটায় যাব। মিস্টার বোসকে বলব, যাতে আপনাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। আপনাদের আপত্তি নেই তো?।'

জ্যাকব আর অনঘ দুজনেই মাথা নাড়ল। আপত্তি নেই।

অনেক রাতে হেন্ড্রিকার ফোন এল। অনেকদিন বাদে ফোন করল হেন্ড্রিকা। সোমক তখন শুয়ে পড়েছিল, কিন্তু ঘুমোয়নি। ফোনটা ভাইব্রেট করতেই সেটাকে তুলে নিয়ে নামটা দেখল। তারপর একটু আশঙ্কিত-স্বরেই বলল, 'বলো।'

'শুভ জন্মদিন, সোমক।'

'আজ!'। ঘড়ি দেখল সোমক। বারোটা বেজে দু-মিনিট। দু-মিনিট আগে ডিসেম্বরের সতেরো তারিখ শুরু হয়েছে, শুরু হয়েছে ওর জন্মদিন। সোমকের চোখদুটো জ্বালা করে উঠল। ওর নিজের মনে না থাকলেও একজন ঠিক ওর জন্মদিন মনে রেখেছে। সোমক বলল, 'হেভ্রিকা, আমার খুব মন-কেমন করছে। তোমার জন্যে।'

হেভ্রিকা বলল, 'আমারও। তুমি এখন কোথায়? আমি যাব?।'

'এই মুহূর্তে একটু দূরে আছি সোনা। কয়েকটা দিন ওয়েট করো। আমিই তোমার কাছে যাব। এই চাকরিটা আমি ছেড়ে দেব হেভ্রিকা। তোমার স্কুলে একটা টিচারের চাকরি দেখে দেবে আমায়? আমি বাকি জীবনটা তোমার গায়ে-গায়ে থাকতে চাই।'

'প্লিজ থেকো। প্লিজ তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

সোমক যখন ফোন ছাড়ল তখন জানলার কাচে ভোরের সবুজ আলো। যমজ সূর্যের ভোর।

'পাপ কি আর একটা? এই মার্কারিডের মাটিতে আমরা যে-পাপ করেছিলাম তার প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে হবে আমি জানি না।

'গ্যালাকটিক ট্রেড অর্গানাইজেশন খুব যত্ন করে তার সমস্ত প্রমাণ মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে; কিন্তু জানেন তো, পাপের চিহ্ন থেকেই যায়। কখনোই তাকে পুরোপুরি মুছে ফেলা যায় না। কিছু ছবি পেয়েছি। কিছু অর্ডারের কপি। এইসব মিলিয়েই আমি সেই সময়টাকে রিকনস্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করেছি। আসুন, আপনাকে দেখাই।'

জনার্দন বোস তাঁর ল্যাপটপটা খুলে হাতের ইশারায় সোমককে পাশে বসতে বললেন। স্ক্রিনে ফুটে উঠল দুই মানব-মানবীর ছবি।

মানব-মানবী বলা ঠিক নয়। সোমকের মনে হল আদিমানব এবং আদিমানবী। সুঠাম, কৃষ্ণকায় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক পুরুষ এবং নারীর সাদা-কালো ছবি। তারা বিশাল এক বৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল। সোমক মুখটা স্ক্রিনের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখল, মেয়েটির হাতভরতি কোনো শাকপাতার বোঝা। ছেলেটি ওরকমই একটা পাতার টুকরো মুখের কাছে ধরে রয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, ওগুলো ওদের খাদ্য।

এর পর কী-বোর্ডের ওপরে জনার্দনের আঙুলের ছোঁয়ায় স্ক্রিনে ফুটে উঠল একটা ডকুমেন্ট। ইংরিজিতে লেখা খুব সংক্ষিপ্ত একটা চিঠি — বাংলায় অনুবাদ করলে যার মানে দাঁড়াবে, 'আমরা জিনের নমুনা পরীক্ষা করে দেখেছি, মানুষের সঙ্গে ওদের যৌনমিলন সম্ভব। সেই যৌনমিলনের ফলে সন্তানও হবে এবং বুঝতেই পারছেন, সেই দো-আঁশলাদের বুদ্ধিবৃত্তি কেমন হবে তা আমাদের কল্পনার বাইরে। ওদের মতন নির্বোধই হবে সম্ভবত। মানবজাতিকে নষ্ট করার এই ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না, অতএব ওদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই। এর পর আপনারা যা ভালো বুঝবেন, করবেন।'

চিঠিটা পড়া শেষ করে সোমক অবাক-চোখে জনার্দনের মুখের দিকে তাকালো। জনার্দন ম্লান হেসে আবার কী-বোর্ডের ওপরে আঙুল ছোঁয়ালেন। মনিটরের ওপরে আরো একটা ডকুমেন্ট খুলে গেল, যাতে লেখা ছিল, 'আর ওই নোংরা গাছগুলো, ওগুলোকেও নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া দরকার। কিছুই রাখার দরকার নেই। টাউনশীপকে এমনভাবেই স্টেরিলাইজ করুন যাতে মার্কারিডের কোনো প্রাণী, কোনো গাছ, কোনো কীটপতঙ্গ ওখানে না থাকে'।

'এই ছবিগুলো দেখুন' — জনার্দন বোস কী-বোর্ডের ওপরে ঝুঁকে পড়লেন।

পর পর কয়েকটা ছবি স্ক্রিনের ওপর দিয়ে ভেসে গেল। কোনো ছবিতে পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে গড়ে তোলা ছোটো ছোটো ঘর। কোনো ছবিতে ওইরকম উলঙ্গ নারী পুরুষের দল। তাদের মুখে আতঙ্ক। তারা মানুষের ভয়ে পালাচ্ছে। শেষ দুটো ছবিতে দেখা গেল বিশাল একটা গর্তের ধারে আধুনিক পোশাকে সজ্জিত কয়েকজন মানুষ, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। পুকুরের মতন বিশাল গর্তটার নীচে পড়ে রয়েছে অসংখ্য আদিমানবের মৃতদেহ। বুঝতে অসুবিধে হয় না, গণকবরের ব্যবস্থা হচ্ছে।

জনার্দনবাবু কম্পিউটার শাট-ডাউন করে, সোমকের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, 'কী বুঝছেন?'

সোমক বিহ্বলভাবে মাথা নাড়ল। জনার্দন বোস বললেন, 'আমি যা বুঝেছি, বলছি।

'এই যে আদিমানবগুলিকে দেখছেন, এরাই ছিল মার্কারিডের ভূমিপুত্র এবং ভূমিকন্যা। ঠিক যেভাবে ইভোলিউশনের ফলে পৃথিবীতে এককোশী প্রাণী থেকে মানুষের উদ্ভব হয়েছে, একইভাবে এখানেও ইভোলিউশন তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

'এই আদিমানুষগুলিও নিশ্চয়ই একদিন সভ্য হয়ে উঠত। আগুন জ্বালাতে শিখত, চাকার ব্যবহার শিখত। তার জন্যে হয়তো আরও কয়েক লক্ষ বছর সময় লাগত। কিন্তু আমরা ওদের সেই সময়টা দিলাম না। আমরা পুরো প্রজাতিটাকেই ঠান্ডা মাথায় খুন করলাম।

'কেন? কারণ আমাদের বীরপুঙ্গবেরা ওই আদিমানবীগুলির সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতে শুরু করেছিল। যে-গ্রহে পৃথিবীর নারীরা বাঁচতে পারে না, সেই গ্রহে কামতাড়িত পুরুষদের পক্ষে তো সেটাই স্বাভাবিক, তাই না? আর আপনাদের জি.টি.ওর বিজ্ঞানীরা তার মধ্যেই দেখেছিলেন অশনিসংকেত। সভ্যমানুষ আর অসভ্যমানুষদের হাইব্রিডে গ্রহটা ভরতি হয়ে যাক, সেটা আপনারা চাননি।

'অতএব শ্লেটের ওপরে আঁকা চকখড়ির দাগের মতন মার্কারিডের মানুষদের মুছে ফেলা হল। পুরুষ মরল, নারী মরল। শিশুগুলিও বাদ পড়ল না। হ্যাঁ লাহিড়িসাহেব। একটা গণকবরের ছবি জুম করলে দেখবেন, ওখানে শিশুদের মৃতদেহও পড়ে রয়েছে।'

কথা হচ্ছিল জনার্দন বোসের বাংলোয় বসে। বারান্দায় নয়, ভেতরের ঘরে। সকাল দশটা বাজে। সোমক এসেছে একঘণ্টা আগে। এসেই কোনো ভণিতা ছাড়া ওই চারজন হারিয়ে যাওয়া মানুষ যে-বাড়িটায় থাকত, সেই বাড়িটায় যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে এবং এটাও বলেছে যে, একা নয়; সে চায় যেন জ্যাকব, অনঘ আর জনার্দনবাবু নিজে তাকে সঙ্গ দেন। জনার্দনবাবু রাজি হয়েছেন।

তারপরেই সোমক অনঘকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছে, তাদের যেতে হবে। সে আর জ্যাকব যেন তৈরি হয়ে জনার্দনবাবুর বাংলোর সামনে চলে আসে। অনঘ বলেছিল, সে দশটার আগে পৌঁছোতে পারবে না, কারণ ইতোমধ্যেই সে পিট-হেডে মানে খনিতে ঢোকার মুখে চলে এসেছে। সেখান থেকে ফিরতে সময় লাগবে।

সোমক নটা থেকে দশটা, পাক্কা একঘণ্টার একটা সময় পেয়ে গিয়েছিল, যে সময়টায় সে জনার্দন বোসের সঙ্গে আরও কিছু কথা বলতে পারে।

কথাপ্রসঙ্গে সে জ্যাকব এবং অনঘের প্রতি তাঁর, মানে জনার্দনবাবুর সহমর্মিতার কথা তুলেছিল। তখনই হঠাৎ যেন জনার্দনবাবুর ভেতর থেকে একজন অন্য জনার্দনবাবু বেরিয়ে এসেছিলেন। এই প্রথম তিনি সোমকের সামনে প্রাণ খুলে কথা বলতে শুরু করেছিলেন।

'কেন সহমর্মিতা থাকবে না বলুন তো?' — বলেছিলেন জনার্দনবাবু। 'কী দিচ্ছি আমরা ওদের? একটা অমানুষিক পরিবেশের মধ্যে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়ে দিচ্ছে ছেলেগুলো। বলতে গেলে শুধু খাওয়া আর পরার নিশ্চিন্ততাটুকুর বিনিময়ে। পৃথিবীতে থাকলে এই নিশ্চিন্ততাটুকুও পেত না বলেই ওদের মতন লাখে লাখে ছেলে এই দূরের মাইনিং-কলোনিতে চলে আসছে। না হলে এই কি একটা মানুষের মতন জীবন?'

সোমক মুখে কিছু বলেনি। কিন্তু মনে-মনে জানত, জনার্দনবাবুর কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। গত মিলেনিয়ামে বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি হয়েছে, তা অভাবনীয়। আলোর কাছাকাছি গতিবেগে ছুটতে শিখেছে মানুষের তৈরি মহাকাশযান। বহুদিন অবধি ইন্টার-গ্যালাকটিক স্পেস-ট্র্যাভেলকে অসম্ভব বলে ধরা হত, অথচ এখন তা ডালভাত। কিন্তু এতসব করে কী লাভ হল? চিরকাল যা হয়ে এসেছে, তাই তো আরও প্রকট হল। বড়োলোকেরা আরও বড়োলোক হল, গরিবেরা আরও গরিব।

ওই যে জনার্দনবাবু বললেন, 'মানুষের মতন জীবন', সেটা যে কীরকম ছিল, সেটাই সবাই ভুলতে বসেছে। শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই। শরীরে আর মনে যারা অসুস্থ, সেরকম কোটি-কোটি যুবক-যুবতি পৃথিবী থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে চলে যাচ্ছে দূরের কোনো গ্রহে কিংবা গ্রহাণুতে। সোমক আর কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। আর তখনই হঠাৎ জনার্দনবাবু এই কলোনিতে ঘটে যাওয়া হত্যালীলার কথা উগড়ে দিলেন সোমকের সামনে। শুরু করলেন ওই কথা দিয়ে — 'পাপ কি আর একটা?।'

সোমক মাথা নীচু করে বসে ছিল। সে শুধু পাপের কথা শুনেই যেতে পারে, কিছু করার ক্ষমতা তার নেই। করলে বিপদ আছে। গ্যালাকটিক ট্রেড অর্গানাইজেশন পরোক্ষে শুধু পৃথিবীকেই শাসন করে না, বহু আলোকবর্ষ অতিক্রম করে তার নিষ্ঠুর হাত এই মার্কারিডের মতন কলোনিগুলোতেও অনায়াসে থাবা বসাতে পারে। কথাটা জনার্দনবাবুও জানেন। তবুও তিনি যে ওই তথ্যগুলো এখনও পার্সোনাল ল্যাপটপে সেভ করে রেখেছেন, তার থেকেই বোঝা যায়, লোকটার ভেতর কোথাও এখনও একটুকরো মরিচাহীন ইস্পাত রয়ে গেছে।

সোমক আবার মনে-মনে বলল, 'চাকরিটা আমি ছাড়বো হেন্ড্রিকা। এই পাপের চাকরি আমি করবো না।'

ওরা দুজনে বাংলোর বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, অনঘ আর জ্যাকব একটা পাম্পঘরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। প্রখর রোদ, কিন্তু সেই রোদ্দুরের হাত থেকে বাঁচার মতন ছায়া নেই, কারণ, গাছ তো দূরের কথা, এই বিস্তীর্ণ কলোনির মধ্যে একটা ঘাস অবধি কোথাও জন্মায় না। সেই প্রথম যুগের কলোনিস্টরা মার্কারিডের নিজস্ব সমস্ত প্রাণকে চিরকালের মতন এই খনি আর তার আশেপাশের জমি থেকে উৎখাত করে দিয়ে গেছে।

সোমকের চোখের সামনে আবার ভেসে উঠল আদিম মানুষগুলোর ছবি। কলোনিস্টদের কাছে ওরাও পোকামাকড় বা আগাছার থেকে আলাদা কিছু ছিল না। পঞ্চাশ বছর আগে জি.টি.ওর ঘাতকেরা ওদেরও চিরতরে শেষ করে দিয়ে গেছে।

'চিরতরে'? হঠাৎ একটা কথা মনে হল সোমকের। দূরের বনে-পাহাড়ে যেমন এখনও গাছপালা, পোকামাকড় সবই রয়েছে, তেমনই সেই মার্কারিডের মানুষরাও কি সেখানে এখনও থাকতে পারে? পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতেই সে জনার্দন বোসকে প্রশ্নটা করল। জনার্দন বোস মাথা নেড়ে বললেন, 'না, বোধহয়। আমি যতদূর জানি, ওই আদিমানবগুলির বিচরণ সীমিত ছিল এই সমতল উপত্যকাটাতে, যেখানে এখন আমাদের কলোনি আর মাইনস। ওরা যে-কোনো কারণেই হোক, পাহাড়ি আবহাওয়ায় স্বচ্ছন্দ ছিল না। কাজেই এখান থেকে ওদের নিকেশ করে দেওয়া মানে দুনিয়া থেকেই নিকেশ করে দেওয়া।'

সোমক আড়চোখে জ্যাকবের দিকে তাকাল। বোঝাই যাচ্ছে, জনার্দনবাবুর কথাগুলো জ্যাকবেরও কানে ঢুকেছে। মাথা নীচু করে চুপচাপ হেঁটে চলেছেন বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণীটি। সোমক মনে-মনে ভাবল, ভাগ্যিস সেনটোরদের কিছু উপযোগিতা ছিল, তাই ওরা এখনও বেঁচে আছে। যদি না থাকত, যদি ওরা নির্বোধ হত, তাহলে ওরাও অনেক আগেই মার্কারিডের আদিমানুষদের মতন হারিয়ে যেত।

জ্যাকব আর জনার্দনবাবু সামনে-সামনে চলেছিলেন। অনঘ ইচ্ছে করেই একটু পিছিয়ে এসে সোমকের সঙ্গ ধরল। জিজ্ঞেস করল, 'কী হল স্যার? মুড অফ মনে হচ্ছে।'

সোমক বলল, 'নাঃ। কিছু না।'

'সুপারভাইজার-সাহেব কি মার্কারিডের আদিমানবদের কথা বললেন আপনাকে?।'

'তুমি জানলে কেমন করে? উনিই বলেছেন?।'

অনঘের ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। বলল, ''আর কে বলবেন? নিজেই বলেন 'টপ সিক্রেট', অথচ নিজেই আবার একে-ওকে না বলে পারেন না। ওঁর মতন নরম-ধাতের মানুষের পক্ষে এই গোপনীয়তার বোঝা একলা বয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন তাই বলে ফেলেন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, হঠাৎই অনঘ চটুলস্বরে বলল, 'মার্কারিডের মেয়েগুলোর ফিগার দেখেছেন, স্যার? সত্যি বলুন, হন্ট করছে না আপনাকে? কী উরু, কী পাছা, কী বুক! আমাদের জন্যেই ওদের বাঁচিয়ে রাখা উচিত ছিল স্যার। কোন শালা তাহলে ঝামেলা করে সেক্স-লিভ নিয়ে পৃথিবীর ফ্যাকাশে মেয়েগুলোর কাছে যেত। আমি অন্তত যেতাম না।'

সোমক উত্তর না দিয়ে অল্প হাসল — দুঃখের হাসি।

হেন্ড্রিকা ইতিহাসের ছাত্রী। ও একবার সোমককে আফ্রিকা আর আমেরিকার মধ্যে স্লেভ-ট্রেডের গল্প বলেছিল। জাহাজ ভরতি করে যখন আফ্রিকার কালো মানুষদের আমেরিকায় নিয়ে আসা হত, তখন কালো মেয়েগুলোকে জাহাজের সাদা নাবিকেরা প্রতিদিন রেপ করত। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় প্রতিদিনের সেই ধর্ষণে বহু মেয়ে মারা যেত। তাদের দেহগুলোকে স্রেফ টান মেরে ডেক থেকে সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হত। যারা আমেরিকায় পৌঁছোত, তারা বেশিরভাগই পৌঁছোত গর্ভবতী অবস্থায়। হেন্ড্রিকা সেরকমই কোনো কালো মেয়ের বংশধর। আর্কারিডের আদিমানবীদের মধ্যে আজ একটু আগে হেন্ড্রিকাকেই দেখেছিল সোমক।

তবে অনঘকে এত কথা বলে লাভ নেই। মানবসভ্যতা এখন খুব দ্রুত পেছনে হেঁটে যাচ্ছে। আজকের অনঘ আর সেদিনের আমেরিকান স্লেভ-ভেসেলের যৌন-ক্ষুধাতুর নাবিকদের মধ্যে খুব বেশি তফাত নেই।

সোমকের মুখ দেখে অনঘ কী বুঝল কে জানে, এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করল না।

একতলা বাড়িটার সদর-দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জনার্দনবাবু পকেট থেকে চাবি বার করে তালা খুললেন। এখানকার শেষ দুজন বাসিন্দা হারিয়ে গিয়েছেন ঠিক পনেরোদিন আগে। তারপর শুধু লোকাল-সিকিউরিটির লোকেদের নিয়ে অনঘ আর জনার্দন বোস দু-একবার এসেছেন। অন্য যে-কোনো জায়গা হলে এতদিনে গ্রিলের গেটে মাকড়সা জাল বুনে ফেলত। এই স্টেরিলাইজড কলোনিতে সেটা হয়নি। তবে চারিদিকে পুরু ধুলো জমেছে।

দুটি মাত্র ঘর। প্রতিটি ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড বাথ। সেগুলোকে ভালো করে দেখে নিতে খুব বেশিক্ষণ সময় লাগল না ওদের। ওদের মধ্যে অনঘ আর জনার্দনবাবু তো আগেই দু-একবার এই বাড়িতে ঘুরে গিয়েছেন; সোমক আর জ্যাকব এই প্রথমবার এলেন।

যারা এই বাড়ির আসল আবাসিক ছিল, অর্থাৎ সেই লেবার দুজন, তারা নিজেদের ঘর মোটামুটি সুন্দর করেই গুছিয়ে রেখেছিল। এর থেকে অন্তত এটুকু প্রমাণিত হয় যে, ডিপ্রেশনে ভুগছিল না তারা।

অন্য কিছুতে ভুগছিল।

পড়াশোনার বইখাতা কিছু ছিল না ঘরদুটোর মধ্যে। দালানের এক কোণে শূন্য মদের বোতল জড়ো করে রাখা ছিল। ব্লু-ফিলমে ঠাসা থ্রিডিয়োস্কোপ ছিল দুজনেরই ক্লজেটের মধ্যে। বাথরুম দুটোর সাদা দেয়ালে খনি থেকে কুড়িয়ে-আনা সিনাবারের টুকরোর লাল রেখায় আঁকা ছিল অসংখ্য যোনি ও লিঙ্গ। খিস্তি লেখা ছিল অনেক। এককথায় যৌন উপবাসের চিহ্ন ছিল চারিদিকে ছড়ানো। কিন্তু তার থেকে তাদের অদৃশ্য হওয়ার কারণ বোঝা গেল না।

বাড়িটায় দুটো শোবার ঘর ছাড়াও একটা কমনরুম টাইপের ঘর ছিল। ঘরের মাঝখানে একটা কাঠের টেবিল। চারটে চেয়ার। টেবিলের ওপরে ছিল তাসের প্যাকেট আর অ্যাশট্রে। এক কোনায় প্লাম্বিং-এর কাজে লাগতে পারে এমন কিছু যন্ত্র, যেমন রেঞ্জ হাতুড়ি, লোহার তার এইসব রাখা ছিল। বাগান করার কোদাল, খুরপি এইসবও ছিল সেখানেই।

ওই টেবিলটার ওপরেই রাখা ছিল একটা বাঁধানো লম্বা খাতা। খাতাটা খুলে সোমক দেখল প্রধানত তাসের জুয়ার হিসেবেই পাতাগুলো ভরতি। তবে একটা পাতায় চোখ বুলিয়ে সে বুঝল সেটা ডিউটি-রোস্টার। আবাসিক দুজনের মধ্যে কবে কে ছাদ আর সিঁড়ি পরিষ্কার করবে, কে কবে বাইরের উঠোন আর জমি পরিষ্কার করবে, তার রুটিন। সোমক কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে পাতাটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর অনঘকে বলল, 'তোমরাও কি এইভাবে পালা করে ঘরদোর পরিষ্কার করো?।'

অনঘ বেজারমুখে বলল, 'করতেই হয়। না হলে কে করবে? চাকর-সুইপার এসব তো আর নেই এখানে। তবে খুব অসহ্য অবস্থায় না পৌঁছোলে কেউই সেরকম গা লাগাই না। এরা দেখছি রেগুলার উঠোন-টুঠোন সাফ করত। আমরা ওসব করি না। যার যেদিন মুড থাকে একবার উঠে ঝাঁট-ফাঁট দিয়ে চলে আসি।'

এরপর ওরা বাড়িটার পেছনদিকে গিয়ে দাঁড়াল। চারপাশে আর কোনো বাড়িঘর নেই। কিছুটা দূরে কলোনির পাঁচিল। পাঁচিলের ওপাশে উঁচুনীচু জমি, মিশেছে গিয়ে একেবারে উত্তরের পাহাড়ে। ঘাস নেই, গাছ নেই। সেই কোনকালে কী যে ব্যবস্থা নিয়েছিল প্রথম যুগের কলোনিস্টরা, তাই নাকি কলোনির এলাকায় গাছপালা গজায় না। অন্তত জনার্দনবাবু সেরকমই বলেছিলেন। কিন্তু এই বাড়িটার ব্যাকইয়ার্ডের ক্ষেত্রে কথাটা খাটে না।

সোমক বিস্মিত হয়ে দেখল, একধরনের লতাগুল্মে ভরে গেছে পেছনের জমিটা। সরু লতানো কাণ্ডগুলো শুধু যে উঠোনটাকেই ছেয়ে ফেলেছে, তাই নয়; লতার স্বভাব অনুযায়ী বাড়ির দেয়াল বেয়েও উঠতে শুরু করেছে। এই বাড়ির উঠোন ছেড়ে লতিয়ে চলে যাচ্ছে অন্য দিকে।

অবাক হয়েছিলেন জ্যাকবও। তিনিও আগে ওই বাড়িতে পা রাখেননি। সোমক আর জ্যাকব দুজনেই সেই লতার স্তূপের মধ্যে দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেলেন। অজস্র ডিম্বাকৃতি পাতায় ভরে ছিল লতাগুলো। পাতাগুলোর গায়ে যেন পুরু করে মোম মাখানো রয়েছে। ঝকঝক করছে সবুজ পাতাগুলো। সোমক একটু ঝুঁকে দেখলো, প্রতিটি পাতার কক্ষে ছোটো-ছোটো মুকুল এসেছে। ফুল ফুটবে নাকি?

অনঘ আর জনার্দনবাবু দুজনেই অপ্রস্তুতমুখে ওদের দিকে তাকিয়েছিলেন। জনার্দনবাবু মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বললেন, 'ইয়ে, ব্যাপারটা একটু আনইউজুয়াল, তাই না? স্যরি। আমার বোধহয় আগেই বলা উচিত ছিল।'

জ্যাকব বললেন, 'আনইউজুয়াল তো বটেই। এই প্রথম কলোনির মধ্যে কোনো সবুজ উদ্ভিদ দেখলাম। এতদিনের মধ্যে এক কুচি শ্যাওলাও জন্মাতে দেখিনি এখানে।'

জনার্দনবাবু বললেন, 'আসলে আমি আর অনঘ আগেও দুবার দেখে গেছি তো। ওই আগের দুটো মিসহ্যাপের পরে যখন এই বাড়িতে এসেছিলাম। হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে আছে, তখনো লতাগুলো ছিল। দুবারই আমি সাফ করিয়েছিলাম। কিন্তু এরা তো দেখছি রক্তবীজের মতন বাড়ছে।'

সোমক বললো, 'এই বাড়ির অরিজিনাল বাসিন্দা দুজন কেন যে নিয়ম করে উঠোন পরিষ্কার করতো, সেটা এখন বুঝতে পারছি। তবে তাতেও এদের রাক্ষুসে গ্রোথ আটকাতে পারেনি।'

জনার্দনবাবু বললেন, 'দেখি, লোক জোগাড় করতে পারলে জায়গাটা আবার পরিষ্কার করিয়ে দেবো।'

এর পর ওরা বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। গেস্ট-হাউসের দিকে ফেরার পথে সোমক প্রশ্ন করেছিল, 'আজ আপনাদের ডিউটিতে যেতে হবে না? দেরি করিয়ে দিলাম মনে হচ্ছে''।

ওরা তিনজনেই সমস্বরে বলল, 'না না। আজ ডিউটি কীসের? আজ তো সৌরমা।'

সৌরমা শব্দটা সোমক জীবনে এই প্রথমবার শুনল। সে বলল, 'সৌরমা মানে?'।

জ্যাকব বললেন, 'প্রতি পনেরোদিন অন্তর মার্কারিডের আকাশে দুটো সূর্য এক সরলরেখায় চলে আসে। সেদিন আকাশের দিকে তাকালে মনে হয়, আকাশে যেন একটাই সূর্য। দেখুন, এখনও দেখতে পাবেন।'

সোমক একবার চোখ কুঁচকে আকাশের দিকে তাকাল। সত্যিই একটা সূর্য বলেই মনে হচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'সৌরমার দিনে কি আপনাদের কাজ বন্ধ থাকে?।'

জনার্দনবাবু বললেন, 'অলমোস্ট। শুধু প্ল্যান্ট খোলা থাকে, কারণ ফার্নেস যখন-তখন শাট-ডাউন করা যায় না। অফিস আর মাইনিং-এর কাজ পুরোই বন্ধ থাকে।'

'কেন? এই দিনটায় ছুটির দেওয়ার মানে কী।'

জনার্দনবাবুই উত্তরটা দিলেন। বললেন, 'আমি যতদূর জানি, এখানে কলোনি গড়ার প্রথমদিকে, এই দিনে প্রকৃতির রাজ্যে নাকি কিছু অস্থিরতা দেখা যেত। আদিমানুষ, পশুপাখি আর গাছপালা সকলেই দুই সূর্যের

মিলিত টানে পাগলের মতন হয়ে যেত এবং তখন নবাগত কলোনিস্টদের পক্ষে ক্যাম্পের বাইরে বেরোনোটা হয়ে যেত বিপজ্জনক। কাজেই সৌরমার দিনে ছুটি দেওয়ার রেওয়াজটা তখন থেকেই চলে আসছে, যদিও আমি কোনোদিন কোনো অপ্রাকৃত ঘটনা ঘটতে দেখিনি।'

একটু চিন্তা করে উনি যোগ করলেন, 'অবশ্য আমি যখন এখানে এসেছি, তখন তো আদিমানুষ বলুন, গাছপালা বলুন, পশুপাখি বলুন, সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেমন করেই বা দেখব?।'

সোমকের মাথার মধ্যে একটা অস্বস্তি শুরু হল। কী যেন একটা প্যাটার্ন সেখানে বারবার গড়ে উঠতে-উঠতেও ভেঙে যাচ্ছিল।

প্যাটার্নটা পরিষ্কার হল দুপুরে, যখন খাওয়া-দাওয়ার পরে সোমক তার নোটস লেখা কাগজগুলো নিয়ে বারান্দায় বসেছিল। হঠাৎই তার মনে পড়ল, আজ সতেরোই ডিসেম্বর — সৌরমা। জনার্দনবাবু বলেছিলেন, এই দিনটা আসে পনেরো দিন অন্তর। তার মানে হিসেবমতন আগের সৌরমা ছিল দোসরা ডিসেম্বর আর তার আগেরটা সতেরোই নভেম্বর। কী হয়েছিল সেই দুটো দিনে?

সতেরোই নভেম্বর দুজন লেবার নিজেদের কোয়ার্টার থেকে হারিয়ে গিয়েছিল।

দোসরা ডিসেম্বর জি.টি.ওর দুজন ইনভেস্টিগেটর সেই একই বাড়ি থেকে হারিয়ে গিয়েছেন। এখনও চারজনের মধ্যে কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আর আজ সতেরোই ডিসেম্বর — আর এক সৌরমার রাত্রি আসছে।

সোমক তখনই জনার্দনবাবুকে ফোন করে বলল, 'আজ রাতে আমি ওই কোয়ার্টারটায় থাকছি। আমার সঙ্গে জ্যাকব থাকবে একজন ন্যাচারালিস্ট হিসেবে আর অনঘ থাকবে আপনাদের কলোনির সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে। আমরা চারজন ছাড়া আর কেউ একথা জানবে না। আপনি ওদের দুজনকে বলে দিন, রাতের খাওয়ার পরে আমার এখানে চলে আসতে। আমরা একসঙ্গেই বেরোব।'

রাত দুটো। যমজ সূর্য দিগন্তে ঢলে পড়েছে। সামান্য সবুজ আভা আকাশে ছড়িয়ে আছে। তারা ফুটেছে অজস্র।

সেই একতলা বাড়িটার ব্যাকইয়ার্ডে সিঁড়ির একটা ধাপের ওপরে বসে ছিলেন জ্যাকব — সেনটোর জ্যাকব। তাঁর সারা শরীর পাথরের মূর্তির মতন স্থির, শুধু পেশল ঘাড়টা বুনো ঘোড়ার ঘাড়ের মতোই মাঝে-মাঝে এদিক থেকে ওদিকে ঘুরছিল। লম্বাটে মুখের ডগায় বসানো বিশাল নাসারন্ধ্র ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজনায় বিস্ফারিত হয়ে উঠছিল। চোখের দৃষ্টি দিয়ে তিনি অনুসরণ করছিলেন সোমক আর অনঘের কার্যকলাপ।

কার্যকলাপই বটে। হালকা অন্ধকারের মধ্যে, উঠোনের লতাপাতার শয্যার ওপরে লুটোপুটি খাচ্ছিল অনঘ আর সোমক। দুজনেই সম্পূর্ণ নগ্ন। ওদের যাবতীয় পোশাক ঘরেই পড়ে রয়েছে, যেমন ছিল আগের চারজনের ক্ষেত্রে।

আজ এই সৌরমার রাতে বিষফুলে ভরে উঠেছে প্রতিটি লতার শরীর। প্রতিটি পর্বসন্ধিকে বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এসেছে একটা করে কালো রঙের ফুল। অদ্ভুত আকার ফুলগুলোর। ঠিক যেন কোনো কৃষ্ণকায় মানুষের হাতের তালু। পাঁচটা রোগা পাপড়ি যেন আলগা করে খুলে রাখা পাঁচটা আঙুল। প্রতিটি মুঠির মাঝখানে এক দলা হলুদ পরাগ। অনঘ আর সোমক যতই লতার স্তূপের ওপরে লুটোপাটি খাচ্ছিল, ততই তাদের সারা শরীরে সেই হলুদ রেণু মাখামাখি হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন গন্ধকের গুঁড়ো দিয়ে স্নান সেরেছে ওরা দুজন।

ওদের এই আজব আচরণের সূত্রপাত রাত দুটোর কাছাকাছি কোনো একটা সময়ে। তার একটু আগে অবধি ওরা তিনজনেই এক সঙ্গে বসে গল্পটল্প করছিল। রাত একটা নাগাদ সোমক আর অনঘ হাই তুলতে শুরু করল। তাই দেখে জ্যাকব বলেছিলেন, 'আপনারা শুয়ে পড়ুন, আমি জেগে আছি। সেরকম কিছু দেখলে ডেকে দেব।' সোমক মুখের সামনে হাত এনে একটা হাই চাপতে-চাপতে বলেছিল, 'আপনার ঘুম পাচ্ছে না?।' জ্যাকব বলেছিল, 'কই না তো, এমনিতেই আমার ঘুম খুব কম।'

তাই শুনে অনঘ বলেছিল, 'ঘুম তো আমারও কম, সে তো আপনি জানেনই স্যার। কিন্তু আজ যে কেমন লাগছে! ঠিক ঘুম নয়, আলসেমিতে পেয়ে বসছে দেখছি।'

তাই শুনে সোমক বলেছিল, 'কী আশ্চর্য! আমারও তো ঠিক ওইরকমই লাগছে।'

জ্যাকব বলেছিলেন, ''ঘুমই হোক আর আলসেমিই হোক, আপনারা একটু শুয়ে নিন। আমি জেগে আছি''।

ওরা দুজনে পাশের ঘরটায় গিয়ে খাটের ওপরে লুটিয়ে পড়েছিল। একটু পরেই দুজনেরই নাক ডাকার আওয়াজ পেয়েছিলেন জ্যাকব। আর পেয়েছিলেন একটা অদ্ভুত গন্ধ। উঠোনের দিকের খোলা-জানলা দিয়ে গন্ধটা ঘরে ঢুকছিল।

জ্যাকব জ্ঞানী, জ্যাকব প্রাজ্ঞ। গন্ধটা চিনতে তাঁর ভুল হয়নি। নিজে মানুষ না হলেও, এই গন্ধ উনি চেনেন। পৃথিবীর কত কার্নিভালের, কত পার্কের, কত স্যুইমিং-পুল এবং গণিকালয়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি এই গন্ধ পেয়েছেন। কতবার কত নারীর সতর্ক-প্রসাধনের সৌরভকে ছাপিয়ে এই ঝাঁজালো রতিঘ্রাণ তার অতিসক্রিয় নাসিকায় ধরা পড়েছে। নারী-শরীরের ক্ষরণের গন্ধ সেনটোরের অজানা নয়।

জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন জ্যাকব। অবাক হয়ে দেখেছিলেন, কখন যেন উঠোনের সবকটা লতাগাছ একসঙ্গে ফুলে ভরে উঠেছে। কোনো সন্দেহ নেই, এই অতিমাত্রায় মানুষী গন্ধটা ভেসে আসছে উদ্ভিদের যৌনাঙ্গ থেকে — ফুল থেকে।

জ্যাকব যেহেতু মানুষ নন, তাই তাঁর মস্তিষ্কে ওই গন্ধের কোনো প্রভাব পড়ল না। তিনি শুধু এক ন্যাচারালিস্টের কৌতূহলে বুক ভরে কয়েকবার শ্বাস টানলেন। ভাবলেন, এর পর কী?

উত্তরের জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না তাঁকে। একটু বাদেই সোমক আর অনঘ উলঙ্গ অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে এল। জ্যাকব ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কী! এইভাবে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছ কেন, অনঘ? কোথায় চললে তোমরা?''।

ওরা কোনো উত্তর দিল না। উত্তর দেওয়ার মতন অবস্থাতেও ছিল না ওরা। ওদের চোখগুলো খোলা ছিল বটে, কিন্তু সেই চোখে কোনো দৃষ্টি ছিল না। ঘুমের মধ্যে হেঁটে যাওয়ার কথাটা এর আগে বইয়েই পড়েছিলেন জ্যাকব, আজ স্বচক্ষে দেখলেন। যেন ঘুমের মধ্যেই হাঁটতে-হাঁটতে ওরা দুজন পেছনের উঠোনে সেই লতাগুল্মের ঝোপের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর উদগ্র কামনায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ফুলের শরীরে।

ওই যে সারা শরীরে ফুলের রেণু মেখে ওরা উঠে দাঁড়িয়েছে। ওরা পাঁচিল টপকে বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে, মাঠে। জ্যাকবও উঠে দাঁড়ালেন। কৌতূহলের সঙ্গে তিনি লক্ষ করলেন, পশুর মতোই ওরা দুজনে মাঝে মাঝে মুখ তুলে কীসের যেন ঘ্রাণ নিচ্ছে।

জ্যাকব কিন্তু দ্বিতীয় কোনো গন্ধ পাচ্ছিলেন না। আর তার থেকেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, যে-গন্ধের রুট-ম্যাপ ধরে ওরা দুজন এগিয়ে চলেছে, মানুষ নন বলেই তিনি সেই গন্ধ পাচ্ছেন না। ওই গন্ধ শুধু মানুষ আরও ঠিকভাবে বললে পুরুষ মানুষের জন্যেই 'টেইলর-মেড'।

জ্যাকব কিছুটা দূরত্ব রেখে ওদের দুজনকে অনুসরণ করে চললেন।

আকাশের নক্ষত্রগুলি যেন মাটিতে নেমে এসেছিল। তৃণহীন অন্ধকার প্রান্তরের ওপরে সেইসব ঝরে-পড়া তারা গড়ে তুলেছিল এক সরল নক্ষত্রবীথি। যেন অজস্র মৃত জোনাকির শরীর দিয়ে গড়া এক পথ জেগে উঠেছিল মাঠের মাঝখানে।

অনঘ সেই তারার স্তূপ পায়ে মাড়িয়ে হেঁটে চলেছিল।

সে জানে না কেন চলেছিল, কোথায়ই বা চলেছিল। সে শুধু এইটুকুই বুঝতে পারছিল যে, ওই নক্ষত্রবীথি তাকে যেদিকে নিয়ে যাবে, যতদূরে নিয়ে যাবে, তাকে যেতে হবে। যেতেই হবে।

তাই সে চলেছিল।

আর একজন মানুষ তার পাশে-পাশেই চলেছিল। তারই মতন বস্ত্রহীন, নগ্ন। অনঘ বুঝতে পারছিল, মানুষটি তার পরিচিত। কিন্তু কী যে সেই পরিচয়, সে-কথা তার মনে পড়ছিল না।

জন্ম থেকে আজ অবধি অনঘ যত শষ্যের দানা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, পান করেছে যত সুরা ও দুগ্ধ, শ্বাস নিয়েছে যত রৌদ্রে ও কুয়াশায়, তাদের প্রতি বিন্দু ঊর্জা আজ কামনা হয়ে তার শরীর ফাটিয়ে বেরোতে চাইছিল। অনঘ চাইছিল কোনো নারীর যোনিপাত্রে শরীরের শেষ বীর্যর বিন্দুটুকু ঢেলে দিতে। তার উত্থিত পুরুষাঙ্গ এক স্বতন্ত্র সত্তর মতন, এক পাথরে নির্মিত অধিদেবতার মতন অপলকে তাকিয়ে ছিল প্রান্তরের দিকে। অনঘ জানে না, কিন্তু ওই অধিদেবতা জানে, এই তারা-বিছানো পথের শেষে কোন দেবী তার প্রতীক্ষায় রয়েছে।

অনঘের পাশের নগ্ন পুরুষটির অবস্থাও ভিন্ন কিছু নয়।

দিগন্তের কাছাকাছি একটা সবুজ আলোর গোলক। একটা, নাকি দুটো? কী যেন ওর নাম? সোমকের কিছুই মনে পড়ছিল না। সে শুধু বুঝতে পারছিল ওই গোলকের টানে তার শিরার ভেতরে একটা অদ্ভুত ইচ্ছা জন্ম নিচ্ছে। নিজেকে অবলুপ্ত করার ইচ্ছা।

যে ইচ্ছা থেকে শুকনো পাতা নিজেকে ছত্রাকের হাতে সঁপে দেয়, যে ইচ্ছা থেকে মড়া বেড়ালের ছানা ম্যাগটের মুখে নিজেকে মেলে ধরে, সেরকমই এক তীব্র ইচ্ছার ঢেউ সোমককে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল।

রাস্তা খুঁজতে হচ্ছিল না, রাস্তা তো তারায় তারায় সাজানোই রয়েছে ওই সামনে। এঁকেবেঁকে চলে গেছে টিলা-পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে। ওই তো, দুটো বিশাল বোল্ডারের আড়ালে লুকোনো এক ফাটলের মধ্যে দিয়ে সেই পথ পাতালের দিকে নেমে গেছে।

সোমকের একবার যেন মনে হল, তার পাশে আর একজন নগ্ন পুরুষ হেঁটে চলেছে। তারও পায়ে একই ব্যস্ততা। তারও উত্থিত পুরুষাঙ্গে একইরকম পুষ্পরেণু প্রলেপ।

ঢালু পথ ধরে কিছুটা নামার পরেই তারাগুলো সোমকের চোখের সামনে থেকে মুছে গেল। তবে, আর তাদের প্রয়োজনও নেই। এই তো গন্তব্য।

যেখানে পৌঁছোনোর কথা ছিল, সেখানে তারা পৌঁছে গেছে।

মাটির নীচে লুকোনো এক বিশাল গণকবর। চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে মার্কারিড-গ্রহের আদিমানবদের কঙ্কাল, আদিমানবীদের কঙ্কাল এবং শিশুদের কঙ্কাল। সোমকের পায়ের নিচে মড়মড় শব্দে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল পঞ্চাশ বছরের পুরোনো হাড়গোড়ের স্তূপ। তবে সেসব তার চোখে পড়ছিল না। সে দেখছিল গণকবরের এখানে-ওখানে মাটির ওপরে শুয়ে আছে বহু কৃষ্ণবর্ণা নগ্নিকা।

নারী-শরীরের এমন মাংসল প্রাচুর্য আগে কখনও দ্যাখেনি সোমক। কেশদামের শয্যা বিছিয়ে শুয়ে রয়েছে অসংখ্য উলঙ্গিনি। শুশুকের মতন নিটোল মসৃণ তাদের ঊরু ও জঘন। বিস্তৃত দুই ঊরুর সন্ধিস্থলে পিঙ্গল যৌনরোমের শৈবালে ঢাকা কালো ঝিনুকের মতন তাদের যোনি। মধুমত্ত মৌমাছি যেভাবে চালতাফুলের কুঁড়িকে কামড়ে ধরে থাকে, সেইভাবে তাদের স্তনের শীর্ষে লগ্ন ছিল উজ্জ্বল বাদামি স্তনবৃন্তগুলি।

চরম আশ্লেষে তাদের ভারী ঊরুগুলি মোচড় খাচ্ছিল। গণকবরের সামান্য আলো তাদের পিচ্ছিল যোনিওষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল সোমকের চোখ।

এই তো এই তো সেই আহুতির আয়োজন।

সোমক একজন নারীকে লক্ষ্য করে কিছুটা এগিয়ে গেল আর ঠিক তখনই তার মস্তিষ্কের কোনো গোপন কন্দর থেকে ভেসে এল হেন্ড্রিকার ডাক — 'তুমি চলে এসো সোমক। আমার আর একটুও ভালো লাগছে না একা থাকতে।'

গণকবরে ঢোকার সেই ফাটলটা দিয়ে কিছুটা নেমে এসেছিলেন জ্যাকব। তারপর আর পারেননি, সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন।

একটু হাঁপিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেটা আশ্চর্য কিছু নয়। সোমক আর অনঘের পেছন-পেছন অন্তত চার-কিলোমিটার রাস্তা তাঁকে প্রায় দৌড়েই আসতে হয়েছে। না দৌড়ে উপায়ই বা ছিল কোথায়? ওরাও দৌড়চ্ছিল যে!

আশ্চর্য ব্যাপার। দিকচিহ্নহীন প্রান্তরের মধ্যে ওরা যেন কোনো অদৃশ্য লাইটহাউসকে লক্ষ্য করে দৌড়োচ্ছিল, এমনই নিশ্চিত ছিল ওদের অভিমুখ। মাঝখানে হয়তো একটা টিলার পাশ কাটিয়ে গেছে, কিংবা একটা খাদ। তাছাড়া মোটামুটি একটা সরলরেখায় এসে ওরা যে কেমন করে এই লুকোনো কবর-দ্বারে পৌঁছে গেল, সেটা জ্যাকবের কাছে এখনও রহস্য। এর একমাত্র উত্তর হতে পারে গন্ধ। টাউনশিপের ওই অভিশপ্ত বাড়ির উঠোনে ফুটে-থাকা কালো ফুলগুলোর গন্ধের মতন, দ্বিতীয় কোনো গন্ধের টানে ওরা এখানে এসেছে।

গন্ধটা যে মানুষদের পক্ষে যৌন-উত্তেজক, সে-ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই জ্যাকবের। কিন্তু গন্ধটা কীসের? তিনি নিজে তো বহুদিনের পচা মাংস আর হাড়ের বীভৎস গন্ধ ছাড়া আর কোনো গন্ধই পাচ্ছেন না। এমনই দুর্বিষহ সেই গন্ধ যে, তাঁর বমি পেয়ে যাচ্ছে। এই গন্ধ তো ওদের টানেনি নিশ্চয়ই। ওরা তো আর আস্তাকুঁড়ের নীল মাছি নয়।

তাহলে কীসের গন্ধ?

প্রশ্নটা নিয়ে ভাববার সময়ই পেলেন না জ্যাকব। তার আগে, অন্ধকারে চোখ সয়ে যেতেই, তিনিও সেই নগ্নিকাদের দেখতে পেলেন।

আদিমানবী? ওরা আবার বেঁচে উঠেছে? পুরুষগুলি কোথায়? প্রতিবর্ত ক্রিয়াতেই জ্যাকব একটা পাথরের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন। সেখান থেকে মুখ বার করে ভালো করে জরিপ করে নিলেন পুরো জায়গাটা।

না, পুরুষ কোথাও নেই। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, নেই কোনো দু-পায়ের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ে। ইতস্তত শুধু কামনাবিধুর ভঙ্গিতে শুয়ে আছে অসংখ্য উলঙ্গিনি। এর মানে কী?

জ্যাকব দেখলেন সোমক আর অনঘ শিকারি বাঘের মতন দুটি নারীকে তাক করে এগিয়ে যাচ্ছে। ঘামে চকচক করছে ওদের শরীর। এত জোরে নিশ্বাস পড়ছে যে, এখান থেকেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওদের বুকের ওঠাপড়া।

অনঘ ধীরে ধীরে এক নগ্নিকার দুই ঊরুর মধ্যে নিজেকে স্থাপন করল। সঙ্গেসঙ্গেই সেই বিশাল ঊরুদুটি মাটি থেকে সামান্য উঠে এসে ঢেকে নিল অনঘের নিতম্ব থেকে পায়ের পাতা। ওর পিঠ আর মাথাও দুই মেয়েলি হাতের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। এমনকি এতক্ষণ মেয়েটির যে চুলের গুছিগুলো মাটির ওপরে মেলা ছিল, কী যেন এক আশ্চর্য মন্ত্রে সেগুলোও অনঘের শরীরের ওপরে এসে পড়ল। ওই মেয়ে নিজের শরীরের মধ্যে নিবিড়ভাবে লুকিয়ে নিল অনঘের পুরো শরীরটাকে।

তবুও অনঘের মৈথুনক্রিয়া বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। তার তুমুল কটিবিক্ষেপে কেঁপে-কেঁপে উঠছিল মেয়েটির গোটা শরীর।

পুরো ব্যাপারটার মধ্যে এমন তুমুল এক জান্তব উল্লাস ছিল যে, কাজটা অশালীন হচ্ছে বুঝেও জ্যাকব চোখ ফেরাতে পারছিলেন না। প্রায় সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি আর সেইজন্যেই খেয়াল করেননি, কখন সোমক পায়ে-পায়ে পিছিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

তাঁর হুঁশ ফিরল সোমকের গলার আওয়াজে।

'হেন্ড্রিকা! হেন্ড্রিকা কোথায় গেল? ওরা কারা? ওই মেয়েগুলোর মুণ্ডু নেই কেন? অনঘ কোথায় গেল, জ্যাকব? আমরা এখানে কীভাবে এলাম?।'

সোমকের এতগুলো প্রশ্নের কোনোটারই উত্তর দিলেন না জ্যাকব। উলটে তিনি ভারি অবাক হয়ে বললেন, 'মুণ্ডু নেই।' পরক্ষণেই তার মনে পড়ে গেল অনঘের ব্যাক-প্যাকটার কথা— টাউনশিপের ওই বাড়ি থেকে দৌড়ে বেরোনোর সময় যেটাকে সামনে পড়ে থাকতে দেখে তিনি তুলে নিয়ে এসেছিলেন। ওটার মধ্যে একটা টর্চলাইট থাকার কথা। জ্যাকব বিদ্যুতগতিতে ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকিয়ে টর্চটা বার করে

আনলেন। পরমুহূর্তেই জোরালো আলোর একটা বিম গিয়ে পড়ল সেই মেয়েটার গায়ে, যার কাছ থেকে একমুহূর্ত আগে সরে এসেছে সোমক।

জোরালো আলোর নীচে স্পষ্ট হয়ে উঠল অবিকল নারীর ঊরুর মতন দেখতে রসালো দুই পাপড়ি, তাদের সংযোগস্থলে যোনি আকৃতির গর্ভমুণ্ড, যোনিকেশের মতো পিঙ্গল গর্ভকেশর আর মাটির ওপরে ছড়িয়ে থাকা চুলের মতন অজস্র লতার শেকড়। না, সত্যিই মুগুর মতন কিছু নেই সেই বিশাল ফুলের গঠনে।

আলোর বিম ঘুরে গেল যেদিকে অনঘ রয়েছে সেইদিকে। ওই ফুলটার পাপড়ির বাঁধন ততক্ষণে আলগা হয়ে এসেছে। ফাঁকে-ফাঁকে দেখা যাচ্ছে অনঘের নেতিয়ে-পড়া শরীর। কোনো এককালে অনঘের গায়ের রং ছিল শ্যামলা। এখন তার চামড়া কাগজের মতন সাদা। চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়েছে। ঠোঁটের একপাশ দিয়ে জিভটাও বেরিয়ে এসেছে অনেকখানি। অনঘ মারা গেছে।

সোমক নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেও ঠকঠক করে কাঁপছিল। কিছুতেই সেই কাঁপুনি থামাতে পারছিল না, কারণ সে পরিষ্কার বুঝতে পারছিল ওই ফুলটা তাকে উন্মুক্ত ঊরুর ইশারায় আবার ডাকছে। আবার তার মন চাইছে ওদিকে যেতে। যদিও গেলে কী হবে সেটা দেখানোর জন্যেই যেন অনঘের একটা শুকনো হাত এইমাত্র ওর কাঁধের সকেট থেকে খুলে ঝুপ করে মাটিতে পড়ে গেল।

জ্যাকব মুখ তুলে সোমকের দিকে তাকালেন। তারপর টর্চের মুখটা নীচের দিকে নামিয়ে অনঘের ব্যাকপ্যাকের ভেতর থেকে একটা তোয়ালে বার করে সোমকের দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন, 'গা থেকে ফুলের রেণুগুলো ভালো করে মুছে নিন। বেঁচে যাবেন। তারপর ওটাই কোমরে জড়িয়ে নিয়ে চলুন, এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। মন বলছে, বাইরে আরও বীভৎসতা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।'

দূরে টাউনশিপের আলো দেখা যাচ্ছিল। জ্যাকব সোমকের হাত ধরে টান দিলেন। বললেন, 'উঁহু, ওদিকে নয়। উলটোদিকে। স্পেস-স্টেশন এখান থেকে বেশি দূরে নয়।'

'স্পেস-স্টেশন!।'

'তা ছাড়া কী? বাঁচতে চান না? এখানকার একমাত্র স্পেস-সাটলটার পাসওয়ার্ড অনঘের ব্যাগটার মধ্যে একটু খুঁজলেই পেয়ে যাবেন। শীপটা পাওয়ারফুল। ওটায় চেপে আপনি পৃথিবী অবধিও চলে যেতে পারবেন''।

সোমক তখনো হতভম্ব ভাবটা কাটাতে পারেনি। অবাক-চোখে জ্যাকবের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, 'আপনি আমাকে পালাতে বলছেন কেন? অনঘ মারা গেল ঠিকই, কিন্তু জনার্দনবাবু, এখানকার বাকি লোক, তারা তো রয়েছেন।'

'থাকবে না। আমরা চল্লিশজন সেনটোর বাদে আর একটিও মানুষ এখানে থাকবে না। আমার ঘ্রাণশক্তি আপনার চেয়ে অনেকগুণ বেশি জানেন তো? আমি তীব্রভাবে ওই কালোফুলের গন্ধ পাচ্ছি। বিষফুল অকারণে ফোটে না। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সারা টাউনশিপ বিষফুলে ছেয়ে গেছে।'

'বিষফুল! বিষফুল! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'চলুন, যেতে-যেতে বলছি,' বললেন জ্যাকব।

একটু থেমে-থেমে জ্যাকব বলে চললেন

'কলোনির একদম একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল ওই অভিশপ্ত কোয়ার্টারটা। সেটাই ওর কাল হয়েছিল। বিষফুলের বীজ সর্বপ্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল ওই বাড়ির উঠোনে। যদি জিজ্ঞেস করেন, ওখানেই কেন? এতবছর বাদেই বা কেন? ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, জানি না। তবে মনে হয়, পঞ্চাশ বছরে এখানকার স্টেরিলাইজার তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল, আর সেই সুযোগেই আবার অঙ্কুরিত হয়েছিল বিষলতা এবং ওরা হয়তো বুদ্ধিমান উদ্ভিদ; গুছিয়ে বসার জন্যে নির্জনতাকেই বেছে নিয়েছিল।

'আমরা আজ সকালে লতাগুলোকে দেখেছিলাম। তখনও তাতে ফুল ধরেনি। ফুল ধরেছিল রাতে। আমি দেখেছি সেই ফুল। আপনি আর অনঘ দেখার মতন অবস্থায় ছিলেন না ঠিকই, তবে নগ্নশরীরে লুটোপুটি

খেয়েছিলেন সেই ফুলের বিছানায়।

'সবার আগে অবশ্য ওই লতায় ফুল আসতে দেখেছিল ওই দুজন লেবার। তার পরে আপনার দুই কলিগ। প্রতি সৌরমার রাতে ওই লতায় ফুল ফোটে। দুর্ভাগ্য ওঁদের চারজনের, সৌরমাতিথির দুই বিভিন্ন রাতেই ওঁরা বাড়িটায় রাত কাটিয়েছিলেন। আর আজ, আর এক সৌরমায়, আমরা রাত কাটালাম। তিনজনের মধ্যে দুজন বেঁচে আছি, একজন মারা গেল।

সোমক প্রশ্ন করল, 'কিন্তু কেন? কীভাবে?।'

'বলছি। তবে তার আগে প্ল্যান্ট-মিমিক্রি সম্বন্ধে আপনার একটু জানা দরকার। উদ্ভিদের জগতে মিমিক্রি, মানে ছদ্মবেশ-ধারণের ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। নানান প্রয়োজনে গাছের পাতা, ফুল কিংবা ফল, অন্য কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের রূপ ধারণ করে। তার মধ্যে একটা প্রয়োজন পরাগমিলন। একটু আগে অবধি আমার জানা সবচেয়ে ভালো মিমিক্রির উদাহরণটি ছিল আপনাদের পৃথিবীতেই, কয়েক জাতের অর্কিডের মধ্যে।

'পরাগমিলনের জন্যে ওই ধরনের অর্কিডেরা টেনে আনে পুরুষ-মৌমাছি কিংবা পুরুষ-বোলতাদের; মধুর লোভ দেখিয়ে নয়, সংগমের লোভ দেখিয়ে।

'এক এক জাতের অর্কিডের ফুলকে দেখতে হয় একেক জাতের মেয়ে-মৌমাছি কিম্বা মেয়ে-বোলতার মতন। ডানা-মেলা মেয়ে-পতঙ্গের মতন তাদের গড়ন, সেইরকমই রোঁয়া-ওলা পাপড়ি। এমনকি শুনলে অবাক হবেন, ওইসব অর্কিডের গন্ধও হয় মেয়ে-পতঙ্গের গায়ের গন্ধের মতন।

'কামোন্মত্ত পুরুষ-বোলতা কিংবা মৌমাছিরা সঙ্গিনীভ্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে অর্কিডের ফুলের ওপরে। পুরুষ-ফুলের আঠালো পরাগধানী তাদের গায়ে আটকে যায়। এর পর তারা যখন কোনো স্ত্রী-অর্কিডের ওপর বসে, তখন সেই পরাগধানী স্ত্রী-অর্কিডের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। ব্যস, পরাগমিলনের কাজ শেষ।

'একইভাবে মার্কারিডের বিষলতার পুরুষ-ফুলগুলি এমন কোনো গন্ধ ছড়ায়, যা পুরুষ-মানুষদের কামুক করে তোলে। বুঝতে পারছেন তো, কেন একটু আগে আপনি নিজের গায়ে পরাগের আস্তরণ মেখেছিলেন? ওই ফুলগুলো চেয়েছিল আপনি মাখুন। চেয়েছিল আপনি ওই পরাগ বয়ে নিয়ে যান ওদের স্ত্রী-প্রজাতির কাছে। এরা যদি অর্কিড হয়, কিছু মনে করবেন না, আপনিই তাহলে অসহায় মৌমাছি।

'মার্কারিডের উদ্ভিদের মিমিক্রি কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বরং বলা ভালো এখানেই শুরু। একটা গন্ধের রেশ মেলাতে না মেলাতেই আর একটা গন্ধ আপনাদের আক্রমণ করেছিল। এবার স্ত্রী-ফুলেদের গন্ধ। যখন আপনাদের গায়ে পুরুষ-ফুলের পরাগ লাগল, তখন আপনাদের টানল স্ত্রী-ফুলেরা।'

জ্যাকবের কথার মধ্যেই সোমক জ্বরগ্রস্তের মতন হাঁপাতে-হাঁপাতে বললো, 'উঃ! সে এক দুঃস্বপ্নের মতন টান। তীব্র এক হ্যালুসিনেশন। দেখছি তারায় গাঁথা পথ। অনুভব করছি রক্তের মধ্যে সূর্যের টান আর সবার শেষে ওই স্ত্রী-ফুলগুলোর মধ্যে নারীর উরু, স্তন আর যোনি দেখে পাগল হয়ে যাচ্ছি! এখন বুঝতে পারছি, আমাদের নিজেদের ফ্যানটাসি ওই ফুলগুলোকে অমন লোভনীয় করে তুলেছিল। নাহলে মিমিক্রি যতই নিখুঁত হোক, মানুষকে কি ঠকানো যায়? স্ত্রী-ফুলগুলোর গন্ধের মধ্যেই ভয়ঙ্কর এক মাদকতা ছিল।'

জ্যাকব বললেন, 'সত্যিই ভয়ংকর। কারণ দেখলেন তো, ওরা মানুষকে দিয়ে শুধু পরাগমিলন ঘটিয়েই রেহাই দেয় না। তারপরে পতঙ্গভুক উদ্ভিদের মতন মানুষের শরীরের রস-রক্ত চুষে নিয়ে তাদের ছিবড়ে করে ফেলে।'

সোমক বলল, 'কিন্তু ওরা এই মিমিক্রি শিখল কাদের দেখে? কাদের শরীর নকল করল ওরা?।'

'কেন? সেই আদিমানবীদের। কত যুগ ধরে কে জানে, এই পতঙ্গহীন, বাতাসহীন পরিবেশে ওরা পরাগমিলনের কাজে আদিমানবদের কাজে লাগিয়ে আসছে। আজ পঞ্চাশ বছর পরেও ওদের জিনের মধ্যে রয়ে গেছে পুরুষমানুষকে পাগল করে দেওয়ার সেই ম্যাজিক। কিছুই ভোলেনি ওরা। সুযোগ পাওয়ামাত্রই কাজে লাগিয়েছে।'

কথা বলতে-বলতে জ্যাকব আর সোমক স্পেস-স্টেশনে পৌঁছিয়ে গিয়েছিল।

একটা টিলার ওপরে স্পেস-স্টেশন, যার মাথাটা টেবিলের মতন সমতল। সেখানে দাঁড়িয়েই সোমক আর জ্যাকব দেখল মার্কারিড-কলোনির অন্তিম দৃশ্য। দেখল, দলে-দলে উলঙ্গ পুরুষ ছুটে যাচ্ছে প্রান্তর পেরিয়ে সেই গণকবরের দিকে। এতক্ষণে ওদের শরীরে নিশ্চয়ই লিপ্ত হয়ে গেছে বিষফুলের পরাগ। এর পর ওরা ঢুকে পড়বে সেই গণকবরের মধ্যে, যেখানে তাদের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে শয়ে-শয়ে ক্ষুধার্ত স্ত্রী-ফুল। মুণ্ডহীনা নারীর মতন তাদের গড়ন।

তারপর মার্কারি-মাইনসের কর্মীদের নীরক্ত মৃতদেহগুলো গণ-কবরে শুয়ে থাকবে। ট্র্যাজেডি হচ্ছে, কবরটা একদিন ওদের পূর্বসূরিরাই খুঁড়েছিল।

অনেকক্ষণ বাদে সেই দৃশ্যের ঘোর কাটিয়ে জ্যাকব বললেন, ''চলুন। আপনাকে স্পেস-শিপটায় তুলে দিয়ে আসি।'

স্পেস-শিপের পাইলট-কেবিনে ওঠার সিঁড়িতে পা দিয়ে, হঠাৎই সোমকের একটা কথা মনে পড়ে গেল। সিঁড়ি থেকে নেমে এসে সে আবার জ্যাকবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে বলল, ''আপনি কি ভেবে দেখেছেন, আপনাদের চল্লিশজন সেনটোরের পক্ষে এটা কত বড়ো সুযোগ? আমাকে যত্ন করে এই স্পেস-শীপে তুলে দিতে এসেছেন কেন? আপনারা এটা ব্যবহার করুন। পালান আপনারা।'

জ্যাকব হাসতে-হাসতে বললেন, 'সেই সুযোগের কথা যে একবার ভাবিনি, তা নয়। তারপর মনে হল, পালিয়ে কোথায় যাব, কাদের কাছে? আমাদের স্ত্রী, আমাদের সন্তানেরা কে কোথায় রয়েছে, কেউ তা জানি না। তারা এখনও বেঁচে আছে কিনা তাও আমাদের জানার উপায় নেই। ওদের পৃথিবীর দাসত্বে ফেলে রেখে, কোন স্বর্গে গিয়ে দিন কাটাব আমরা এই চল্লিশজন সেনটোর?

'তার চেয়ে এই মার্কারিডের মাটিতেই কিছুদিন স্বাধীনতা উপভোগ করি, যতদিন না আপনারা আবার আমাদের বাঁধবার জন্যে শেকল-হাতকড়া নিয়ে ফিরে আসছেন।

'মনখারাপ করবেন না, মিস্টার লাহিড়ি। আমি জানি আপনি অন্যধরনের মানুষ। নিন, রওনা হয়ে পড়ুন। হেন্ড্রিকা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন''।

সোমক চমকে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'হেন্ড্রিকা! আপনি হেন্ড্রিকার কথা জানলেন কেমন করে, জ্যাকব?'

জ্যাকব বললেন, 'খুব বেশি কিছু জানি না। শুধু এইটুকু জানি আপনার প্রাণের নাম হেন্ড্রিকা, যার পিছুডাক শুনে আপনি আজ একটু আগে মৃত্যুর গভীর সম্মোহন থেকে জেগে উঠেছিলেন। তাঁকে এই হতভাগ্য অশ্বমানবের শুভেচ্ছা জানাবেন।'

স্পেস-শিপের আলোর বিন্দুটা মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবার পরে জ্যাকব টিলা থেকে নেমে এলেন — একা।

* * *